ISSN: 3107-3824 (Online)

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2 Issue 1
2026

Research and Development Cell
Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra
P.O. Sultanicherra, Hailakandi, Assam, India-788162
ESTD 2020

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Aim

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis is dedicated to fostering interdisciplinary dialogue and collaboration across the humanities and social sciences. We aim to serve as a vibrant platform for scholars and researchers to explore the intersections and interdependence among diverse fields including History, Political Science, Economics, Education, Literature, Mathematics, and Geography.

Scope

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis invites submissions that breakdown disciplinary boundaries and offer fresh perspectives on complex geo-socio-cultural phenomena. The journal welcomes original research articles, critical reviews and methodological reflections that demonstrate innovative approaches, theoretical insights and empirical findings across multiple disciplines.

The scope of JMRA encompasses but is not limited to:

- Exploring historical context and narratives that inform contemporary political, economic and social dynamics.
- Analyzing political ideologies, institutions and behavior in relation to socio-economic factors and historical legacies.
- Investigating economic theories, policies and practices and their implications for societies and individuals.
- Examining educational theories, policies, and practices and their impact on learning outcomes and social equity.
- Emerging with literary texts, genres and cultural expressions to uncover deeper insights into human experiences and societies.
- Exploring mathematical concepts in both fundamental and application mathematics through results, models, theories, and postulates along with their applications within and outside the area of mathematics
- Investigating geographical patterns, processes and phenomena and their implications for human societies and the environment.

For submission of research articles and for any other queries regarding the journal, please mail to researchcell@pdugmck.ac.in or visit us at https://pdugmck.ac.in/index.php/journal/

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief:

Dr. Nabajyoti Bhattacharjee
Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Associate Editors:

Dr. Md Sahnewaz Sanu
Department of Economics,
Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Dr. Nazmul Hussain Laskar
Department of Political Science,
Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Editorial Advisory Board

Dr. Georgia Irina Oros
University of Oradea, Romania
Dr. Mohammad Shekh Sadi
University of Chittagong, Bangladesh
Dr. Saber Ahmed Chowdhury
University of Dhaka, Bangladesh
Dr. Joyati Bhattacharya
Assam University, Silchar
Dr. Md. Tarique
Aligarh Muslim University
Dr. Nabendu Sen
Assam University, Silchar

Section Editors

Dr. Abdul Wakil Ali: Economics
Dr Titan Rudra Paul: Bengali
Mr. Tayybur Rahman: English
Mr. Mantu Mali: Political Science
Dr Mahabubur Rahman Laskar: History
Mr. Sandip Sutradhar: Education
Dr Nabajyoti Bhattacharjee: Mathematics
Mr. Jaman Hussan Ahmed: Library Science

TABLE OF CONTENT

Research Article	Authors	Page
বেদান্তে বৈদিক দেবতা	Gobinda Sarkar	1-9
Using reservoirs wisely to overcome the challenges of water scarcity	Nandita Dutta	10-18
গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ	Bablu Barman	19-25
Sustainable Fisheries Governance in Assam: Protecting Traditional Fishing Communities and Indigenous Rights	Abdul Wakil Ali	26-40
অনিরুদ্ধ ও করালী---পুণর্বিচার ও পুণর্নির্মাণ : প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাস	Souvik Bagchi	41-46

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2, Issue 1 (2026)
https://pdugmck.ac.in/index.php/journal-jmsa/

বেদান্তে বৈদিক দেবতা

সংক্ষিপ্তসারঃ

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাদানুবাদ, তা নয়।সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম, হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম, হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, চতুরাশ্রম ও চতুবর্ণবিধি- **সমস্তই বেদান্ত প্রতিপাদিত শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত। সহস্র সহস্র বছর ধরে হিন্দুজাতি অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হয়েছে। সম্পদে-বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবে অদ্বৈতমুখীন নিষ্কামধর্ম পালনে হিন্দুত্ব মরণকে অতিক্রম করেছে।** কত-না সভ্যজাতি কালগর্ভে বিলীন হল, **কিন্তু হিন্দু অমর**- কেন না, **বেদান্তরস তার অস্থিমজ্জাকে সততই স্নিগ্ধ করছে। হিন্দুর দর্শনে ও ধর্মে, সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ** করেছে, তার সম্যক্ বোধ **আবশ্যক।বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক ব্যবহারসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম না হলে কোন ফল হয় না**- কেবল **বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল এই বিষয়ে** আলোচনা করা হবে।

Gobinda Sarkar "Vidyabhushan"

Department of Sanskrit,Sabour College, Sabour (Bhagalpur), India
Email: gsarkar084@gmail.com
Corresponding Author*: Gobindo Sarkar
Email of Corresponding Author*: gsarkar084@gmail.com

Keywords: ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, **বহুদেবতাবাদ**, হিন্দু ধর্ম, বৈদিক দেবতা, বেদান্তদর্শন।

Received: *4th Octobar 2025,* **Accepted:** *14th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

অনেক বছর আগে আচারবান্ হিন্দুদের মধ্যে এক প্রশ্ন উঠেছিল, যে, সত্যি সত্যিই গঙ্গা কি এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছেন, না, তিনি অন্তর্হিতা হয়েছেন? কয়েক জন পণ্ডিতে মিলে হঠাৎ শাস্ত্রের এক বচন আবিষ্কার করলেন যে,-

"কলৌ দশসহস্রানি বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীম্।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা॥"[1]

[1]স্কন্দপুরাণম্ – ২/৪/৩৫/৩২

অর্থাৎ কলিযুগের দশহাজার বছর পর্য্যন্ত বিষ্ণু ভূতলেথাকবেন।জাহ্নবী তার অর্দ্ধেক এবং গ্রাম্যদেবতা তারও অর্দ্ধেককাল থাকবেন। বলা বাহুল্য, তার পর তাঁরা অন্তর্হিতা হবেন।

তখন হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে, জাহ্নবীর যাওয়ার সময় হয়েছে, এবং গ্রাম্য দেবতারা বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছেন।এই আবিষ্কার হওয়া মাত্রেই সমাজে মহা আলোড়ন উপস্থিত হল।তা হলে গঙ্গাস্নানে আর ফল কি? আর গ্রামের বিবিধ দেবদেবীরা কিসের জোরে পূজা খাচ্ছেন? তাঁরা যে কেউই নাই। ধর্মজগতে অরাজকতার আশঙ্কা করে সুধিবর্গ আবার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে বরাহপুরাণের আর একটী বচন আবিষ্কৃত করলেন এই যে,-

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।
তদৈব বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীং নরপুঙ্গব॥"[2]

অর্থাৎ কলির অন্তিমেই গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করবেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ই যাবেন। এখনও সে অন্তিমকাল আসে নাই।অতএব এখনও গঙ্গায় স্নান করলে এবং বিষ্ণুর পূজা করলে পুণ্যের সম্ভাবনা আছে।

ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিলেন- এবং সেই ব্যবস্থা প্রতি বছর পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতে লাগল- যে, বিভিন্ন বচনের একবাক্যতা সম্ভব হলে, বাক্যভেদ কল্পনা করবে না; অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় বচনের মধ্যে শেষোক্তটাই গ্রহণ করবে।

এই ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের একবাক্যতার ধারণাটা প্রশংসনীয় কি না, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা ঠিক, যে, আচারবান্ হিন্দু বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তিরোভাবে বিশ্বাস করতে চায় না। বৈদিক দেবতাগণ যে হিন্দুর জীবনে, তাদের চিন্তায় এবং ধর্মে, এখনও লোপ পান নাই, এটাই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। কিন্তু এই আন্দোলন হতেও বোঝা যায় যে, দেবতাতে বিশ্বাস বজায় রাখবার জন্য আন্বীক্ষিকীর নিয়ম লঙ্ঘন করতেও হিন্দু সব সময় কুণ্ঠিত হয় না।

প্রতীক-উপাসনা এখনও হিন্দুসমাজে বর্তমান রয়েছে; এখনও গৃহে, মন্দিরে, তীর্থে হিন্দু মৃন্ময়, হিরণ্ময়, পাষাণময়, কিংবা দারুময় বিবিধ মূর্ত্তির পূজা করে থাকে। এবং এখন বোধ হয় হিন্দুই জগতের একমাত্র সভ্যজাতি, যে, আজও মূর্ত্তির পূজা ত্যাগ করে নাই। সুতরাং দেবগণ এখনও মর্ত্ত্যে বর্তমান রয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, তাঁদের যাওয়ারও যে ঢের দেরী আছে, তাও পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ বচন-সমূহের একবাক্যতা দ্বারা প্রমাণ করে রেখেছেন।

অবশ্যই, এক বিষ্ণু ছাড়া বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আজকাল আর কেউ বড় পূজা পান কি না সন্দেহ।পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সময় বোধ হয় বরুণের পূজা হয়ে থাকে; তাছাড়া, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বিশ্ব-দেবগণ, মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বিস্মৃতপ্রায়; এবং কেউ কেউ– যেমন অগ্নি কালে-ভদ্রে এক-আধটু পূজা পেয়ে থাকেন মাত্র। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে সত্যপীর, শনৈশ্চর, মনসা প্রভৃতি অনেক অবৈদিক, এমন কি, অনার্য্য দেবদেবী বৈদিক দেবগণের স্থান অধিকার করে বসেছেন।

কিন্তু বর্তমানে উপাসিত দেবগণ ঠিক বৈদিক দেবতা না হলেও, এটা ঠিক যে, বহু-দেবতায় বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে। এখন যাঁরা উপাসিত হচ্ছেন, সে সব দেবগণের কেউ বা খাঁটী বৈদিক; কেউ বা বেদের সময়ে অমূর্ত্ত কিংবা অস্ফুট-মূর্ত্তি ছিলেন, বর্তমানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন; আর কেউ বা, একেবারে বেদের বাইরে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন।কিন্তু হিন্দুর জগৎ যে দেবগণশূন্য নয়, এটা ঠিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের জগৎপ্রপঞ্চে চেতন এবং জ্ঞানবান্

[2]শ্রীচৈতন্য-বাণী, ২৮শ বর্ষ, পৃ.- ২১২

জীবসমূহের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। মানুষের উপরে, দেহবান্ কিংবা বিদেহ, অন্য কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্ বিদিত নন, এবং বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস- মানুষের উপরে এবং হয় ত বা মানুষের চেয়ে অনেক রকমে শ্রেষ্ঠ, অশরীরী কিংবা সূক্ষ্ম-শরীরবান্ আরও চেতন সত্তা বর্তমান আছে। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, প্রভৃতি যে শুধু লৌকিক উপকথার জীব, তা নয়; শিষ্ট সাহিত্যে-উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি রাজধানীতে উৎপন্ন, শিক্ষিত সমাজের উপভোগ্য, কালিদাস প্রভৃতির রচনায়ও- এই সব জীবের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। আর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতির চেয়েও বড় বিবিধদেবদেবীরাও বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন।

স্বর্গীয় দূত কিংবা angel প্রভৃতিতে বিশ্বাস ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মেও রয়েছে। গেব্রিয়েল, মাইকেল প্রভৃতি স্বর্গের দূতেরা ধর্মে এবং কাব্যে- জ্ঞানে এবং কার্যে- পাশ্চাত্য জগতে অনেকবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে-সব দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের রশ্মিপাত সহ্য করতে না পেরে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি কায়-হীন কিংবা অতিকায় বহুবিধ জীবই এখন অন্তর্হিত হয়েছেন; এমন কি স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ভগবানের সিংহাসনও কেঁপে উঠেছে। ভগবান্‌কে কোনও রূপে মানতে রাজী হলেও গ্রীকদের কিংবা হিন্দুদের মত বিশ্বময় দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগৎ আর করতে রাজী নয়, এটা আমরা সর্বদাই দেখছি। গ্রীকদের এথিনি, জিউস্ প্রভৃতি দেবদেবীরা শুধু যে পৃথিবীর এপারে ওপারে যাওয়া-আসা করতেন, তা নয়, প্রায়ই তারা মানুষদের সঙ্গে মিশতেন- এমন কি, কখন কখন বা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করতেন; এবং সর্বদাই তারা মানুষের প্রদত্ত পূজা এবং সম্মান আকাঙ্ক্ষা করতেন– এবং সেই জন্যই মানুষের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করতেও সচেষ্ট থাকতেন। হিন্দুর দেবতারাও বেদের সময় হতে ঠিক এমনই ভাবে মানুষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে আসছেন। কিন্তু গ্রীস খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে দেবতাদেরকে ত্যাগ করেছে; গ্রীসে আর এখন মন্দিরে মন্দিরে এথিনি কিংবা এপোলোর পূজা হয় না।ভারত শুধু আজও দেবতাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে; ভারতেই শুধু এখনও দেবতার পূজা ও আরতি হয়ে আসছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম ইয়োরোপে, গ্রীসের এবং রোমের দেবগণকে নির্ব্বাসিত করেছে; আর, খ্রীষ্টান ধর্মের ভিতর যে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি,- ঈশ্বরের চেয়ে ছোট অথচ মানুষের চেয়ে বড়,-জীব ছিল,তাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত করেছে সে দেশের দর্শন এবং বিজ্ঞান।Swedenborg প্রভৃতি দু'এক জন সৃষ্টিছাড়া, দলছাড়া লোকের কথা বাদ দিলে, পাশ্চাত্য দেশের লোকদের মতে এখন এই বিশাল জগৎ একটা জড়ের সমষ্টি; অথবা একটা মানস-সৃষ্টি; এবং এর পেছনে ঈশ্বরের চৈতন্য অথবা অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি রয়েছে; আর, এই প্রাকৃতিক শক্তি কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই এই জগৎ প্রপঞ্চ চালিত হচ্ছে।এই জগতের ভিতরে চেতন, অচেতন, মানুষ, অমানুষ, বহু প্রকার জীব এবং বহু প্রকার পদার্থ বর্তমান রয়েছে; কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বর- এ উভয়ের মাঝামাঝি দেবজাতীয় আর কোনও সত্তা নেই। আকাশে যে মেঘ ডাকে, তার কারণ এবং কৈফিয়ৎ তারা জানে, কিন্তু কোন ইন্দ্র সেখানে বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধ করেন না। আগুণ যে দহন- শক্তি সম্পন্ন, সে কথা তারা জানে; এবং কেন যে আগুণ পোড়ায়, তার রাসায়নিক কারণও তারা অবগত আছে; কিন্তু দেবতা এর মধ্যে থেকে তাদের পূজার দাবী করতে পারেন, এটা তারা কল্পনা করতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর বিশ্বাসের বাইরে, দেবতা আর নাই।হিন্দুর বিশ্বাসে কিন্তু তিনি এক রকম মৌরসী কায়মী পাট্টা নিয়ে বসেছেন; ভবিষ্য পুরাণের মতে দেবতাদের যাওয়ার সময় হয়ে থাকলেও, বায়ু পুরাণের মতে আবার সেটা স্থগিত হয়ে যায়; এবং বরাহ- পুরাণের মতের সঙ্গে একার্থতা রক্ষা করতে হয় বলে, তাদেরকে আমরা কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।

হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু একেশ্বরবাদী নয়, সে বহু দেবতায় বিশ্বাস করে,- ইত্যাদি প্রকার অভিযোগ ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান মিশনরীরা করতে আরম্ভ করলেন। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ উপনিষদের **"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"**[3],**"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**[4] প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত করে বাক্‌যুদ্ধে মিশনরীদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুও একেশ্বরবাদীই বটে; এবং বহু দেবতা শুধু সাধারণ লোকদের জন্য; ও বিশ্বাসটা ঠিক ধর্ম নয়, ওটা একটা কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয় এবং ক্রমশঃ শিক্ষার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কুসংস্কার দূর হবে, সে আশাও তাঁরা করতে লাগলেন। এই শিক্ষার আলোক বিস্তারের চেষ্টা- এবং উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন হতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিরূপে হয়েছে, তা এখনও বর্তমান ছাড়িয়ে ঐতিহ্যে পরিণত হয় নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

একেশ্বরবাদ এবং বহুদেবতার উপাসনা, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এখন উত্থাপন করাই অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক হবে। কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করেও বহু দেবতায় বিশ্বাস করা যায় কি না; এবং উপনিষদের ঋষিরা তা করতেন কি না? এটা আমরা জিজ্ঞাসা করতে অবশ্যই পারি যে, বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল? ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের পর হতেই আস্তে আস্তে রোমীয় এবং গ্রীসীয় দেবতারা সব নিরুদ্দেশ হয়েছেন, এটা আমরা জানি; ভারতে যে বেদান্ত, ন্যায়, এমন কি বৌদ্ধ ও লোকায়ত মত প্রচারের ফলেও দেব- মন্দির সব ধ্বংস হয়ে যায় নাই, তাও ঠিক।কিন্তু বেদান্তে বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল? বেদান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন কি? বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রভৃতির সঙ্গে বেদের বহুদেবতাবাদের স্বভাবতঃই একটা বিরোধ আছে বলে মনে হয়।এবং যাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের উপর একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরা উপনিষদকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং উপনিষদে বৈদিক দেবতাদের সমাধি হয়ে গিয়েছে- এটাই তাদের ধারণা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনেক সময় উপনিষদের ব্রহ্মবাদে বৈদিক বহু দেবতার একীকরণ এবং তাঁদের পৃথক সত্তার বিলোপ দেখে থাকেন; এবং এই মায়ামূলক জগতে মানুষের যতটুকু বাস্তবতা আছে, ততটুকু বাস্তবতাও বেদের দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করে থাকেন।

সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য ডয়সেন্‌অবশ্যই খাঁটী কথাটা ধরেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, Xenophanes যেমন গ্রীক দেবতাতে আস্থাহীন হলেও তাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই, উপনিষদের ঋষিরাও তেমনই বৈদিক দেবতাতে ক্রমশঃ আস্থা হারিয়ে ফেললেও, তাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই।কিন্তু ব্রহ্মমূলক বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে দেবতাদের স্থান ঠিক কোথায়, সে বিচার ডয়সেন্‌ও করেন নাই। আবার, ডয়সেন্‌ যতটুকুতে দৃষ্টি দিয়েছেন, অনেকে ততটুকুও দেখেন নাই; এবং উপনিষদের ঋষিরা যে দেবতাদেরকে একেবারে বাতিল ও নামঞ্জুর না করে বরং জগতের প্রপঞ্চের কোনও এক স্থানে তাঁদেরও থাকবার স্থান করে দিয়েছেন এবং তাঁদের সম্বন্ধেও যে তাঁরা চিন্তা করেছেন, এ কথাটাই অনেকে মানেন না, কিংবা জানেন না।

তেরখানা প্রধান উপনিষদের অনুবাদ করতে গিয়েHume[5] বলেছেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে উপনিষদে বৈদিক দেবগণে বিশ্বাস করবার আর কোনও প্রয়োজন রইল না। অর্থাৎ উপনিষদে সে বিশ্বাস দূর হয়ে গেল।

[3]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৩/১৪/১

[4]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৬/২/১

[5] Thirteen Principal Upanishads: Hume. Page – 52.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যায় নাই।এত সব দর্শনের প্রচার সত্ত্বেও যেমন হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ হতে দেবতার পূজা লোপ পায় নাই, তেমনি ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের ফলে উপনিষদেও দেবতার প্রতি বিশ্বাস একেবারে লোপ পেয়ে যায় নাই।ব্রহ্মের আবির্ভাবের পরেও ঋষিদের চিত্তে দেবগণ রয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মুক্তির জন্য যেমন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, তেমনি এই দেবতাদের সম্বন্ধেও ঋষিরা কথঞ্চিৎ মাথা ঘামিয়েছেন।

বেদে যেমন অগ্নি বরুণ প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করা হত, উপনিষদেও সেটা একেবারে লোপ পায় নাই।যথাঃ-

☆**"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্"**[6]প্রভৃতি দ্বারা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করছেন!

☆তৈত্তিরীয় উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে বেদের অনেক দেবতাকেই দেখতে পাই-

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ॥ শং নো ভবত্বর্য্যমা॥ শংনো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ॥ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥"[7] ইত্যাদি।

বেদে যেমন দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান চলত, উপনিষদে তাও রয়েছে, যেমন নচিকেতা ও যমের সংবাদ। আর একটাসাধারণ সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মোটেই লোপ পায় নাই। বরং অনেক সময় সেই সব যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হত; জনকের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই যাজ্ঞবল্ক্যের দীর্ঘ বিচার হয়েছিল।[8]সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে বৈদিক দেবতারা একেবারে সর্বস্বান্ত হন নাই; তাঁরা পূজাও পেতেন এবং প্রার্থনাও শুনতে পারতেন।

কিন্তু উপরে আর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব-বীজ এবং সকলের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁদের পদবী কিছু খাটো হয়ে গেল।মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ আর তাঁরা রইলেন না।শুধু উপাসিতব্য এবং শুধু প্রার্থয়িতব্য আর তাঁরা থাকতে পারলেন না।জাগতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁরাও আলোচ্য এবং বিচার্য্য বিষয় হয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন-উপনিষদে (২ য় প্রঃ) ভার্গব বৈদর্ভি প্রশ্ন করছেন-

"ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাংবিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃপুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি।"[9]

সকলের চেয়ে একজন বরিষ্ঠ দেবতার অনুসন্ধান চলছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারাও যে যার কর্তব্য করে যাচ্ছেন। সূর্য, পর্জন্য, বায়ু, পৃথিবী কেউই যান নাই তবে সকলেই একজন বরিষ্ঠের অধীন হয়ে পড়েছেন এবং কাজেই এখন কার কি কাজ, তা বিচারের বিষয় হয়ে পড়েছে।

বৃহদারণ্যকেও জনকের সভায় সমাগত কর্মবিদ্ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন-**'কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্য?'**[10]উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য একাধিক গণনাপদ্ধতির আভাস দিয়েছেন।এক প্রকার গণনায় দেবতাদের সংখ্যা তিন শত তিন, প্রকারান্তরে তিন হাজার তিন; আবার তেত্রিশ, কিংবা ছয়, কিংবা অর্দ্ধ কিংবা একও তাদের সংখ্যা দেখানো যেতে পারে। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি- এই প্রধান কয়জনকে ধরলে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ হয়। অগ্নি,পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য এবং দ্যৌঃ- এই গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় ছয়।সকল দেবতাই তিন লোকে বিভক্ত হয়ে আছেন; লোক-গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় তিন। আর সকলের প্রধান, সকলের আশ্রয়, সকলের

[6]ঈশোপনিষদ্ - ১৮

[7]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (শীক্ষাবল্লী) শান্তিমন্ত্র

[8]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩য় অধ্যায়

[9]প্রশ্নোপনিষদ্ – ২/১

[10]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩/৯/১

অধিপতি **'প্রাণ'** বা ব্রহ্মকে ধরলে দেবতারা প্রকৃতপক্ষে এক বই দুই নন। সেই ব্রহ্মকে **'ত্ব'** বা তিনি বলেউল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইত্যাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর হতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্ম এসে সকল দেবতাকেই গ্রাস করে বসেছেন বটে, কিন্তু একেবারে হজম করে ফেলতে পারেন নাই।নাম ও রূপের বৈচিত্র্য মধ্যে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান; কিন্তু দেবতাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপও একেবারে ভিত্তিহীন বলে পরিত্যক্ত হয় নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখতে পাই যে, ব্রহ্মবিদের পক্ষেও দেবতারা একেবারে অস্তিত্বহীন হয়ে যান নাই; বরং তাঁরা তখনও বলি আবহন করে থাকেন।- **"স বেদ ব্রহ্ম।সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি।"**[11]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেবতার উপাসনা এবং দেবতায় বিশ্বাস উপনিষদে লোপ পায় নাই। কিন্তু তাঁদের অনাদিত্ব লোপ পেয়েছে।তাঁরাও সৃষ্ট জীব।সমস্ত বিশ্ব যেমন এক ব্রহ্মের বিভূতি প্রকাশ করছে, সেই বিশ্বেরই অংশ হিসাবে দেবতারাও তেমনই ব্রহ্মের মহিমা দ্যোতনা করছেন।কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের অস্তিত্বের জন্য মানুষ্যাদি হীনতর জীবের মত ব্রহ্মের নিকটই ঋণী। তাঁরা হয়ত পূর্বে ভাবতেন যে, যেহেতু তাঁরা নরের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করতেন, সুতরাং তাঁরা সকলেই স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ং প্রভু। কিন্তু কেনোপনিষদে দেখতে পাই যে, **"ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।"**[12]কিন্তু ব্রহ্ম তাঁদের নিকট আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, দেবগণের দেবত্ব তাঁর থেকেই উৎপন্ন; তাঁর আদেশেই বিদ্যুৎ ঝলকে।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হতেই প্রসূত হয়েছেন- **"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ।"**[13]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু দ্বারা চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করে, যেমন অগ্নিহতে চারদিকে বিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি **"এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"**[14] সমস্ত ভূতগণের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন হয়েছেন। এরাও সকলেই ব্রহ্মের সৃষ্টি। ঐতরেয় উপনিষৎ ও বলছেন- **"স ঈক্ষতেমে নু লোকালোকপালান্নু সৃজা ইতি।"**[15]তবে, অন্য সৃষ্টি হতে দেবতা সৃষ্টিকে পৃথক্ করতে হলে বলতে পারা যায় যে, তা ব্রহ্মের অতি-সৃষ্টি- **"সৈষা ব্রহ্মণোঽতি সৃষ্টিঃ।"**[16]

প্রজাপতির দুই সন্ততি– দেব এবং অসুর। **"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।"**[17] এখান থেকেও দেবতাদের সৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-উপনিষৎ বলেনঃ **"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে।"**[18]এই মিথুন আর কিছু নয়- আদিত্য, এবং চন্দ্রমা।

দেবগণ যে শুধু ব্রহ্ম হতে প্রসূত- ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন, তা নয়। ব্রহ্মই তাঁদেরকে শাসনও করে থাকেন। যথা-

---

[11]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – ১/৫

[12]কেনোপনিষদ্ – ৩/১

[13]মুণ্ডকোপনিষদ্ –২/১/৭

[14]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ –২/১/২০

[15]ঐতরেয়োপনিষদ্ -১/৩

[16]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৪/৬

[17]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৩/১ , ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ১/2

[18]প্রশ্নোপনিষদ্ – ১/৪

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ প্রজতি নিঃসৃতম্। ভয়াদস্য অগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে-

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে॥ ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ॥ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি॥"[19]

ব্রহ্মের ভয়েই যে সূর্য্য তাপ দেন, অগ্নি উত্তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হন এবং ইন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্য করে থাকেন, এটাই উপনিষদের বিশ্বাস।বৃহদারণ্যক এই কথাটাই আরও সুন্দর করে বলেছেন-

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমাসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিবৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ"[20] ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপনিষদে বেদের দেবগণ সৃষ্ট জীব হয়ে পড়েছেন; এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের ভিতরেও মানুষের ন্যায় বর্ণভেদ আছে; সেখানেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তফাৎ রয়েছে। যথা, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশানকে দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় (**'দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যোযমো মৃত্যুরীশান ইতি'**[21]) বলেছেন; আর, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্য গণ, বিশ্বদেবগণ এবং মরুদ্ গণকে বৈশ্য-দেবতা বলা হয়েছে এবং পূষন্-কে শূদ্রবর্ণ বলা হয়েছে।

দেবগণ মানুষের মত সৃষ্ট; লোকভেদে এবং বর্ণভেদে বিভক্ত; এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন।কিন্তু মানুষের উপরের স্তরের জীব এঁরা; সুতরাং মানুষের উপর আধিপত্য এদের যায় নাই।মানুষের বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দেবতাদের অধিষ্ঠাতৃত্বেই হয়ে থাকে। ঐতরেয় উপনিষৎ বলেন যে, দেবগণ সৃষ্ট হয়ে মহৎ অর্ণবে পতিত হলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন।তখন তাঁরা আত্মাকে বললেন, "আমাদের একটা দাঁড়াবার স্থান (আয়তন) করে দিন, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা অন্ন সংগ্রহ করতে পারি।"[22] তখন আত্মা তাঁদের কাছে ক্রমে, গো ও অশ্ব প্রভৃতি এনে উপস্থিত করলেন; কিন্তু তারা বললেন **'ন বৈ নোঽয়মলমিতি'**[23]-এতে আমাদের কিছুই হবে না। তখন আত্মা মানুষকে সেখানে এনে উপস্থিত করলেন। দেবতারা খুসী হয়ে বললেনবেশ হয়েছে- **'সুকৃতং বত।'**[24] আত্মা বললেন, "তোমরা যে যার আয়তনে প্রবেশ কর।তখন অগ্নি বাক্য হয়ে মানুষের মুখে প্রবেশ করলেন; বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায় প্রবেশ করলেন; আদিত্য দৃক্-শক্তি হয়ে চোখে, দিক্ সমূহ শ্রোত্র হয়ে কর্ণে, ওষধি-বনস্পতিরা লোম হয়ে ত্বকে, এবং চন্দ্রমা মন হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।[25] ইত্যাদি।সুতরাং মানুষের উপর দেবতাদের আধিপত্যটা রয়েই গেল; মানুষ তাঁদের ভোগ্য হয়েই রইল।

কিন্তু এই এক বিষয়ে দেবতারা মানুষের চেয়ে বড় হলেও, সব বিষয়ে নন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, তাঁরাও মানুষের মত সৃষ্ট, এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের অধীন এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের ভয়ে ভীত। এটা ছাড়া আরও একটী

[19]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – ২/৮
[20]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩/৮
[21]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৪/১১
[22]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/১
[23]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/২
[24]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/৩
[25]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ১/৪

গুরুতর বিষয়েও তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন।তারাও অমুক্ত, তাঁরাও বিগ্রহবান্, এবং তাঁদেরও মুক্তির প্রয়োজন আছে।তাঁদেরও দেহেন্দ্রিয়াদি রয়েছে, তাঁদেরও ভোগ হয়, তাঁদেরও স্থানভেদ, স্বভাবভেদ এবং কার্য্য-ভেদ রয়েছে; এবং এই সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া তাঁদেরও মানুষেরই মত প্রয়োজনীয়।

জৈমিনি আচার্য্য বলেছেন, **'ন দেবানাং দেবান্তরাভাবাৎ'** ;- উপাস্য অন্য দেবতা আর নাই বলে দেবতাদের কর্মে অধিকার নাই।অধিকার বলতে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব এই দুইটী জিনিস বোঝায়।কর্মের সামর্থ্য দেবতাদের আছে বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজন- কোন অর্থিত্ব তাঁদের নাই; সুতরাং কর্মের বিধি তাঁদের বেলা খাটে না।কিন্তু জ্ঞানের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নয়, এটাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত। বেদান্তজ্ঞানের অধিকার- তদ্বিষয়ে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব- শুধু মানুষেরই আছে এমন নয়। মানুষের মধ্যে সকলের, যথা শূদ্রের (বেদান্ত সূত্র ১/৩/৩৪), অবশ্যই উপনয়নে অধিকার নাই; সুতরাং বেদে ও বেদান্তেও অধিকার নাই।তথাপি মানুষের বেদান্তে অধিকার অবশ্যই আছে; কিন্তু শুধু মানুষেরই আছে, এমন নয়।

'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ'[26]-মানুষের উপরিস্থ জীব দেবতাদেরও বেদান্ত জ্ঞানে অধিকার- অর্থিত্ব এবং সামর্থ্য- রয়েছে।

কর্ম দ্বারা যা পাওয়া যায় তা তাঁরা পেয়েছেন, সুতরাং কর্মের প্রয়োজন তাঁদের নাই।কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষ তাঁরা লাভ করেন নাই; সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন তাঁদেরও রয়েছে।

শুধু যে অধিকার তাঁদের আছে, এমন নয়। দেখা যায়,মাঝে মাঝে তাঁরা সে অধিকারের সদ্ব্যবহারও করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন যে, **"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"**[27]অর্থাৎ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশো বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন।তাতেও তিনি মুক্ত হয়েছিলেন কি না, সন্দেহ; কেন না, এখনও আকাশে মেঘ ডাকে। তবে, তাঁর যে মুক্তির প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে যে তাঁর ইচ্ছার অভাব নাই, তাহা প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু এই অর্থিত্ব ও সামর্থ্য দেবতাদের আছে কি না- তাঁদেরও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই মুক্তিলাভ করতে হবে কি না- সে বিষয়ে স্পষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।বাদরায়ণ একাধিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁদেরও সে প্রয়োজনটা রয়েছে। আর, সূত্রকারের অর্থ যেখানে স্পষ্ট, সেখানে টীকাকারদের মতভেদ হওয়া কঠিন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শঙ্কর, রামানুজ এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, দেবতারাও দেহী, তাঁদেরও ভোগ হয়; তবে, তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্তরের দেহী; এবং সেই জন্য একই সময়ে যুগপৎ একাধিক স্থানে তাঁরা পূজা গ্রহণ করতে পারেন।কিন্তু তথাপি মুক্তির প্রয়োজন তাঁদেরও রয়েছে।

বাদরায়ণ নিজেই বলছেন যে, জৈমিনি আচার্য্য এই মত গ্রহণ করতে নারাজ।[28]কিন্তু বাদরায়ণ যুক্তিজাল বিস্তার করে বেদান্তে দেবগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তুমুল চেষ্টা করেছেন।তাঁর সে সব যুক্তির বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, বেদান্তে দেবগণের পদাবনতি ঘটেছে বটে, কিন্তু তাঁরা মোটেই লোপ পান নাই।পরাভূত পরাধীন জাতির মত তাঁরা ব্রহ্মের প্রশাসনে রয়েছেন; কিন্তু তথাপি রয়েছেন; এবং যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্ত না হবেন, বাদরায়ণের মতে অন্ততঃ- সেই পর্যন্ত তাঁরা থাকবেনই। আর, যাদেরমতে মুক্তির

[26]বেদান্ত সূত্র – ১/৩/২৬

[27]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৮/১১/৩

[28]বেদান্ত সূত্র – ১/৩/৩১-৩২

কোন প্রয়োজন তাঁদের নাই, তাঁদের মতেও তাঁরা অবশ্যই থাকবেন। সুতরাং দেবতারা মুক্তই হউন, আর অমুক্তই হউন, বেদে যেমন বেদান্তেও তেমনি তারা বিদ্যমান রয়েছেন।

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের সঙ্গে বহু দেবতায় বিশ্বাস যে একেবারে করা যায় না, তা নয়।উপনিষদ্ অবশ্যই দেবতাদেরকে একেবারে চরম সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না; সেটা তার অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিশেষতঃ **"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"**[29] কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা সত্ত্বেও যেমন ব্যবহারিক জগতে বহুর প্রতীতি সম্ভব হয়ে থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় হলেও এই বিশ্বেরই মাঝে তির্য্যগাদি বিভিন্ন যোনির জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের অস্তিত্বও সম্ভব হয়েছে।

অতি বড় অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত্রিপুরাসুন্দরী গঙ্গা প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র রচনা করেছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। যেমন পিতামাতা, গুরুশিষ্য, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির ভেদ ব্যবহারিক জীবনে শঙ্করও স্বীকার করেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ দেবদেবীর ভেদও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।অবশ্যই তাঁর মতে অন্তিমে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়মূলক সকল ভেদই যেমন অধ্যাস মাত্র, তেমনই বিভিন্ন দেবগণের নানাত্বও একটা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।কিন্তু এ জগৎ প্রপঞ্চ যতটুকু সত্য, দেবগণ তার চেয়ে কম সত্য নন। বরং এই জগৎ- প্রপঞ্চ বলতে আমরা যা বুঝি, তারই ঊর্দ্ধদেশে এই দেবগণের নিবাস।

সুতরাং কেউ যদি বলেন, বেদান্তে বৈদিক দেবতারা সব তিরোহিত হয়েছেন- সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের মত, ব্রহ্মের আবির্ভাবে তারা সব যে কোথায় উধাও হয়েগিয়েছেন, তার কোন ঠিকঠিকানা নাই- তা হলে, তিনি যে ভুল বলবেন, আশা করি, অতঃপর এটা স্বীকৃত হবে।

সহায়ক গ্রন্থঃ-

☆রামনারায়ণআচার্য, (১৯৪৮), ***ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদ্***, নির্ণয় সাগর প্রেস।

☆ সুকুমারীভট্টাচার্য, (১৯৬০), ***ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য***, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

☆উপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়, ***মনু-সংহিতা*** *(চতুর্থসংস্করণ)*, বসুমতীসাহিত্যমন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬সাল।

☆অমূল্যচরণবিদ্যাভূষণ, ***প্রচীনভারতেরসংস্কৃতিওসাহিত্য***, কলিকাতা, ১৩৬৯সাল।

☆*The Journal of TheRoyal Asiatic Society* of Great Britain and Ireland for1897.

☆আচার্যশ্রীরামশর্মা, ***১০৮ উপনিষদ*** (সাধনাখণ্ড), যুগ নির্মাণ যোজনা, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ২০০৫, মহা উপনিষদ ৬-৭২, পৃষ্ঠা- ১৯৩।

☆সুধাকরমালবীয়, ***গোভিল গৃহ্যসূত্র***, চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০১৬।

☆মিশ্র জগদীশচন্দ্র, ***পারস্কর গৃহ্যসূত্র***, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০১৮।

☆রামনারায়ণবিদ্যারত্ন তথা আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ, ***আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র***, বাপটিষ্ট মিশন, কলকাতা, ১৮৬৯।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***ঋগ্বেদ সংহিতা*** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***যজুর্বেদ সংহিতা***(শুক্ল ও কৃষ্ণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***অথর্ববেদ সংহিতা***, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

[29]কঠোপনিষদ্ – ২/১/১০

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 1, Issue 2 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

Using reservoirs wisely to overcome the challenges of water scarcity

Abstract

The scarcity of water has emerged as a significant concern across the globeand is intensified by factors such as shifting climate patterns, rising populations and poor management of water resources. Reservoirs serve as crucial infrastructure by storing excess water during wet periods and supplying it during times of scarcity. Proper operation of these facilities demands balancing several goals – securing reliable water supply, preventing safeguarding natural ecosystems. Floods, generating hydropower and this article delves into how effective reservoir operations can help in mitigating water shortages, promoting sustainable development and adapting to climate fluctuations. Through the use of integrated planning, innovative technologies, and stakeholder engagement, reservoir systems can contribute significantly in creating a future where water is operation of these facilities demands balancing more equitably and reliably managed. Proper several goals – securing reliable water supply, preventing floods, generating hydropower and safeguarding natural ecosystems. This article delves into how effective reservoir operations can help in mitigating water shortages, promoting fluctuations. Sustainable development and adapting to climate Through the use of integrated planning; innovative reservoir systems can contribute technologies, and stakeholder engagement, significantly in creating a future where water is more equitably and reliably managed. The paper emphasizes that reservoirs are not just storage structures but complex systems requiring coordinated planning across water supply, flood control, hydropower generation, and ecosystem preservation.

Nandita Dutta

Department of Commerce,NC College, Badarpur, Assam, India
Email: n33andita125@gmail.com
Corresponding Author*: Nandita Dutta
Email of Corresponding Author*: n33andita125@gmail.com

Keywords: Water scarcity, Sustainable development, Climate change adaptation, Reservoir management, integrated water resources management

Received: *8th December 2025,* **Accepted:** *9th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

1. Introduction

Water shortages are increasingly recognized as a serious global problem, threatening not only public health and economic development but also the stability of natural ecosystems. The issue of water scarcity is gaining recognition as a pressing global problem.It poses serious risks to human well-being, disrupts economic progress, and undermines the resilience of societies. Beyond its impact on people and economies, limited water availability also endangers the balance of natural ecosystems. As rivers, wetlands, and groundwater reserves decline, biodiversity suffers and ecological stability is put at risk, making water scarcity a challenge that spans both human and environmental dimensions. Water scarcity describes situations where the availability of water is limited, and it can occur in two main forms: physical and economic. Physical scarcity happens when natural water supplies in a region are insufficient, meaning Water resources are depleted faster than they can recover. Climate change intensifies this issue by disrupting rainfall patterns, leading to more frequent droughts and floods that further strain resources. On the other hand, economic scarcity takes aries when people lack the financial means or infrastructure to access safe and reliable water, even if it exists in their environment. This highlights that scarcity is not only about the physical absence of water but also about inequality in distribution and affordability (see The Sustainable Development Goals Report 2019).

According to United Nations data, more than half of the world's population experiences water shortages for no less than one month every year. This statistic underscores the scale of the challenge and the urgent need for sustainable water management strategies to ensure equitable access for all.Forecasts suggest that by the middle of the twenty first century, a substantial portion of the global population will reside in regions where people face significant constraints in obtaining freshwater. This growing crisis is caused by a combination of factors, including rapid population expansion, increasing urbanization, shifting climate patterns that lead to prolonged droughts, and inefficient systems for managing water resources. In response to these pressures, reservoirs have become crucial for water management. They allow for strategic storage of water during heavy rainfall and its controlled release during dry spells, ensuring a more consistent supply for cities, farms, industries, and environmental needs. In addition to their role in water supply, reservoirs also help moderate the effects of extreme weather by reducing flood risks and mitigating drought conditions. However, managing these systems is complex which requires a careful balance between competing priorities such as supplying water, controlling floods, generating

hydropower, and maintaining ecological health. Achieving this balance demands integrated planning approaches that recognize the interconnected nature of water systems, environmental sustainability and human activity. Societies can strengthen their resilience to water-related challenges through thoughtful reservoir management, and move closer to achieving long-term development goals. (Gorguner, M., et al, 2020).Recent studies reinforce this perspective. Joshi et al. (2024) examined Bengaluru's urban water scarcity and demonstrated how geospatial tools and GIS-based monitoring can help predict shortages and optimize reservoir operations in rapidly urbanizing regions. Similarly, Mao (2024) highlighted the multi-functional role of reservoirs in balancing water supply, flood control, hydropower generation, and ecosystem preservation under climate change conditions, emphasizing the need for adaptive strategies. At the policy level, NITI Aayog (2023) compiled best practices in water management across India, underscoring the importance of participatory governance, stakeholder collaboration, and integrated water resource management (IWRM) in ensuring sustainable reservoir use.

Together, these insights illustrate that reservoirs are not only technical infrastructure but also socio-ecological systems that require holistic management approaches. By integrating innovative technologies, adaptive strategies, and inclusive governance, societies can strengthen their resilience to water-related challenges and move closer to achieving long-term development goals.Tools such as GIS, remote sensing, and predictive modeling are highlighted as transformative in optimizing reservoir operations and improving efficiency.With climate change intensifying droughts and floods, the question probes how adaptive strategies can strengthen resilience and reliability of reservoirs.The paper stresses that inclusive governance—engaging governments, communities, and organizations—is essential for transparency, accountability, and sustainable outcomes.The question ensures that environmental flows, biodiversity, and long-term water security are not overlooked in the pursuit of human demand.

2. Objective

The objectives of this study are:

1. To examine the role of reservoir management in mitigating water scarcity under changing climatic and socio-economic conditions.

2. To analyze how integrated planning, mathematical modeling, and technological innovations can improve reservoir operations for sustainable water supply, flood control, hydropower generation, and ecosystem protection.

3. To evaluate recent policy frameworks and stakeholder collaboration mechanisms that strengthen resilience in water-scarce regions.

4. To propose strategies for balancing competing demands on reservoirs while ensuring long-term sustainability and equitable water distribution.

Adjusting to changing climate patterns

Climate change intensifies water scarcity by changing patterns of precipitation, increasing extreme weather events, and reducing snowpack's. To address these challenges, reservoir management must evolve through improved monitoring, predictive modeling, and adaptive strategies. By preparing for upcoming climate changes and adapting operational practices, managers can strengthen resilience thusminimizing the dangers linked to water scarcity .

3. Leveraging modern technology

Technological advances are transforming reservoir management by improving both effectiveness and efficiency. Reservoir managers use tools such as remote sensing, Geographic Information Systems (GIS), and hydrological modeling to monitor water levels, predict inflows, and optimize operations in real-time. Moreover, innovative approaches to water conservation and demand management help reduce reliance on reservoirs, easing pressure on limited water resources and promoting sustainable water use. (Rocha, J., et al., 2020).

4. Strengthening stakeholder collaboration:

Managing reservoirs effectively relies on the active involvement and colloboration of a wide range of stakeholders—such as government bodies, water service providers, local communities, and environmental organisations. Engaging these stakeholders creates space for the exchange of insights, values, and concerns, which supports building consensus and making decisions together. When stakeholders are included throughout the stages of planning, operations, and governance, it leads to greater transparency, accountability, and public trust in management settlements.

Reservoirs play an essential role in tackling water scarcity by ensuring a reliable water supply, lessening the effects of climate fluctuations, and contributing to long-term sustainability goals. To fully realize their potential, it is crucial to adopt holistic and adaptable management approaches, integrate innovative technologies, and encourage inclusive participation of stakeholders. By prioritizing investing in strong water infrastructure and applying effective governance practices, communities can improve their resilience to water stress and secure reliable water resources preserved for future generations.The functioning of reservoirs is an essential aspect of planning and management of water resources system.

5. Mathematical Model for Reservoir Management

Reservoir management can be represented through a water balance equation that accounts for inflows, releases, losses, and storage:

$$S_{t+1} = S_t + I_t - (R_t + E_t + L_t)$$

Where:

S_t = storage volume at time

I_t = inflow during time (rainfall, river inflow)

$\mathbf{R_t}$ = release for water supply, irrigation, hydropower, etc.

E_t = evaporation losses

L_t = leakage/seepage losses

The goal of reservoir management is to maximize water reliability while minimizing shortages and environmental damage.

Example Solution

Suppose:

Initial storage S_t=100 million m³

Inflow I_t =50 million m³

Losses E_t=10 million m³

Maximum storage capacity S_{max}=200 million m³

If release R_t=80 million m³, then:

S_{t+1}=100+50-80-10=60{million\ m³}

This solution shows that after meeting water demand, the reservoir still retains 60 million m³, ensuring ecological flows and future supply

6. Interpretation of the Example Solution

The computed storage value of 60 million m³ after accounting for inflows, releases, and losses demonstrates that the reservoir is able to meet the immediate water demand of 80 million m³ while still maintaining a significant reserve. This residual storage is critical for several reasons:

1**. Ecological sustainability**: The remaining water ensures that minimum ecological flows can be maintained downstream, supporting aquatic ecosystems and biodiversity.

2**. Future reliability**: By retaining 60 million m³, the reservoir provides a buffer against upcoming dry spells or unexpected increases in demand, thereby enhancing resilience.

3**. Operational efficiency**: The storage level remains well below the maximum capacity of 200 million m^3, indicating that the reservoir is operating within safe limits and has scope to absorb additional inflows during subsequent rainfall events.

4. **Balanced management**: This example highlights the importance of balancing releases for human consumption and agriculture with the need to preserve water for environmental and future use.

In essence, the solution illustrates how mathematical modeling of reservoir operations can guide decision-makers in achieving multi-objective management—meeting present demand, safeguarding ecosystems, and preparing for climatic variability. It underscores the role of reservoirs as adaptive infrastructure that not only supplies water

7. Explanation

Though reservoirs play a vital role in managing water resources, yet they encounter multiple difficulties that hinder efforts to address water scarcity. A major issue is sediment buildup, which gradually leads to decrease in storage capacity and limits water availability. Approaches such as dredging and flushing can help resolve this problem, though they require careful planning and substantial funding.

Significant Environmental concerns also arise from reservoir development. Loss of habitat of niche animals, disrupted ecosystems, altered river flows, and declining water quality are some of the potent negative consequences. Mitigating these effects calls for sustainable practices such as maintaining environmental flows, restoring habitats, and monitoring water quality.(Manos, B., et al, 2004).

Climate change in addition adds another layer of complexity, with shifting temperatures and precipitation patterns questioning reservoir reliability.Future resilience can only be achieved by adapting to these evolving conditions. In spite of these hurdles, reservoirs offer valuable opportunities to strengthen water security. Multi-functional reservoirs support agriculture, flood control, and energy production thus delivering broad benefits from limited water supplies. Adopting Integrated Water Resources Management (IWRM) helps coordinate surface and groundwater use, promoting balanced and sustainable water use across different sectors.

Innovative technologies further enhance reservoir management. Real-time data systems, predictive models, and remote sensing tools allow managers to make informed decisions

timely, improving efficiency and adaptability in the face of changing environmental conditions.

The integration of water-efficient technologies and smart infrastructure can greatly improve water management in reservoir catchment areas, helping to ease demand and boost water availability. Successful reservoir management roots on effective governance systems and strong policy support that encourage coordination, cooperation, and accountability among involved parties. Governments play a key role in creating clear regulations, setting priorities for water distribution, and offering financial aid to support sustainable management practices. In cases where reservoirs cross national borders, International partnerships and legal agreements are key factors to address shared water issues and ensure fair distribution.Stakeholder and community participation is of great importanceas it ensures that management decisions align with local needs and priorities. Initiatives such as public education, community meetings, and collaborative decision-making strengthens commitment and cultivates a sense of responsibility, making reservoir management more sustainable and widely endorsed within the community. Additionally, strategic partnerships between government bodies, non-profits, researchers, and businesses can mobilize diverse expertise and resources to tackle water challenges more effectively.

Reservoir management tackles water scarcity by ensuring a steady and sustainable supply of water for different sectors. But Achieving effective reservoir management necessitates an integrated approach—how social, economic, and environmental factors as well as climate change are all connected. By utilizing integrated strategies, embracing new technologies, and involving stakeholders and communities in the process, reservoir systems can be made more resilient and water resources secured for both today and the future. (Manos, B. D., et al., 2010)

Sustainable funding is a must to keep reservoir management efforts going strong over time. Governments, global organizations, and development agencies can extend help by offering grants, loans, and teaming up through public-private partnerships to support building, maintaining, and upgrading reservoir systems. Beyond this, strategies such as user fees, water pricing, and ecosystem service compensation can provide sustainable income to handle daily expenditures and support environmental protection. Training programs, capacity-building efforts, and platforms for sharing knowledge can also empower local communities to engage

in decision-making and apply best practices for managing reservoirs in a sustainable way.(Ma, J., et al, 2011).

8. Conclusion

Robust reservoir management plays a vital role in mitigating water scarcity and ensuring long-term water availabilityin response to fast-evolving ecological and societal dynamics Employing integrated comprehensive, flexible, and ecosystem centred strategies—alongside the application of advanced technologies and the promotion of social equity and resilience—can significantly strengthen water reservoir infrastructure and improve the delivery of ecosystem services. The effectiveness of these efforts relies on the establishment of sustainable financial frameworks, the development of technical and institutional capacities, and the advancement of international partnerships. Committing to sustainable reservoir management is fundamental to preserving water resources and promoting public health, economic stability, and environmental stewardship for both current and future populations.

References

Daniel P. Loucks .et .al (2005).WATER RESOURCES SYSTEMS PLANNING AND MANAGEMENT – ISBN 92-3-103998-9- © UNESCO.

Gorguner, M.,Kavvas, M. L. (2020). Modeling impacts of future climate change on reservoir storages and irrigation water demands in a Mediterranean basin. Science of the Total Environment, 748:141246.

Hooper, B. P. (2005). Integrated River Basin Governance: Learning from International Experience. IWA Publishing, London, United Kingdom.

Joshi et al. (2024).Urban Water Security: Geospatial Insights into the Water Scarcity of Bengaluru City during 2023–2024. *JIndian Soc Remote Sens* 52, 1865–1871.

Manos, B., Bournaris, T., Silleos, N., Antonopoulos, V., Papathanasiou, J. (2004). A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management. Environmental Monitoring and Assessment, 96:85-98.

Manos, B. D., Papathanasiou, J., Bournaris, T., Voudouris, K. (2010). A DSS for sustainable development and environmental protection of agricultural regions. Environmental monitoring and assessment, 164:43-52.

Ma, J., Hipel, K. W., De, M. (2011). Devils lake emergency outlet diversion conflict. Journal of Environmental Management, 92(3):437-447.

Mao, K. (2024). The role of reservoir management in mitigating water scarcity challenges. Ukrainian Journal of Ecology. 14:43-46.

NITI Aayog (2023). Compendium of best practices in water management 3.0.National Institution For Transforming India (NITI) AAYOG, NEW DELHI

Rocha, J et.al (2020). Impacts of climate change on reservoir water availability, quality and irrigation needs in a water scarce Mediterranean region (southern Portugal). Science of the Total Environment, 736:139477.

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2, Issue 1 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ

সারসংক্ষেপ

কর্ম মানুষের জীবদেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে মানবকে ন্যূন্যতম ইন্দ্রিয়চালিত কর্ম করতে হয়। যথা আহার, মল মূত্র ত্যাগ। কারণ প্রত্যেক কর্মে কিছু না কিছু ফল আসে। মানুষের কর্মই ধর্ম, ধর্মেই মুক্তি। নিজ নিজ কর্মের **মধ্য দিয়েই মানুষ উন্নতি সাধন করে। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী হওয়া। যে কোন কর্মই সুখ,** শান্তি, আনন্দানুভূতি দেয়। আনন্দ অনুভূতি থেকেই পরম নির্বাণ লাভ হয়। গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ বলেছেন। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই যে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি উদয় হয়, তার দ্বারা পরাভক্তি জন্মে। পরাভক্তিতে মোক্ষপ্রাপ্তির হয়।

Bablu Barman "Vidyaratna"
Department of Sanskrit, Raiganj University, India
Email: bablubarman0205@gmail.com
Corresponding Author*: Bablu Barman
Email of Corresponding Author*: bablubarman0205@gmail.com

Keywords: গীতা, মানব, কর্ম, মোক্ষ, ফল।

Received: *14th October 2025,* **Accepted:** *14th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

প্রস্তাবনা- প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মের ও কর্মের শিক্ষা জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ চরিত্রে ও ধর্মে, গুণে ও কর্মে বড় বা ছোট হয়, উচ্চ বা নীচ হয়। কর্তব্য কর্ম করে কেও কখনো নীচ বা ছোট হয়না। গীতা এই শিক্ষা দেয় নীচ বংশে জন্মেও যার অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা, উন্নত চরিত্র, ধর্মপরায়নতা প্রভৃতি গুণে মহৎ হয়। তাদের মহানুভবতা ও আদর্শকে সম্মুখে রেখে চলতে হয় তাই বলা হয়েছে-"মহাজেন যেন গতাঃ স পন্থাঃ।" শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে আচরণ করবে ইতর জনেরাও তা করবে। শ্রীমদ্ভগবতে আছে-

"যদ্যদাচরিত শ্রেয়ানিতর স্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"[১]

কর্ম যতই নীচ হোক না কেন মানুষকে কখনো নীচ করে না। জগতে গুণের আদর চিরদিনই করেছে। শ্রমসাধ্য কর্ম করা শ্রেষ্ঠ এবং গৌরবজনক। মহৎগুণ সকলের অন্তরে

বিরাজমান থাকবে। সুখ দুঃখ ভোগ কর্মের ফল যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল ভোগ করবে। কর্মের মাধ্যমেই ফল প্রাপ্তি হবে।

গীতায় ভগবানের নির্লিপ্ত কর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে গুণ ও কর্মবিভাগ অনুযায়ী চারবর্ণের সৃষ্টি করেন। জ্ঞানযোগে নির্লিপ্ত কর্মদিয়ে মুমুক্ষ ভক্তের আদর্শ ও স্থিতিপ্রজ্ঞার লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্ত দেন-

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তরমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্□"[২]

অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আমি ওর সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার রহিত বলেও জানিও।

গুণাধীশ ঈশ্বর ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাহায্যে নির্লিপ্তভাবে সৃষ্টিস্থিতি কার্য করেন। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম হলো-যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। অল্পসত্ত্বগুণ বিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ করা।[৩] অল্প তমোগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্যদের স্বাভাবিক কাজ হলো কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। তমঃপ্রধান শূদ্রের স্বাভাবিক কাজ হলো অন্য তিন বর্ণের শারীরিক সেবা করা। চারবর্ণের কাজগুলোর সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম নিয়তঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দাতি তচ্ছৃনু□
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্□
স্বকর্মণা তমর্ভচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ□"[৪]

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে, স্বকর্মে তৎপর থাকিলে কিরূপে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করবে। যা থেকে ভূত সমূহের উৎপত্তি বা জীবের কর্মচেষ্টা, যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছেন। মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁর অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। শুধুমাত্র শূদ্রই সমাজের সেবক নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই সমাজের সেবক এবং সকলেই নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা ভগবানের অঙ্গ মনে করে, তার যথাযথ সেবার দ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারেন। সাত্ত্বিক ব্যক্তির আদর্শ হবে নিষ্কাম সেবা, নির্লোভ সেবা-তার সেবা কোনও বিনিময়ের ধার ধারে না, কোন প্রাপ্যের লোভ রাখে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ হয়ে কেউ রোগীর শুশ্রূষা করে না। সেখানে বৃত্তিভোগিনী কারিনীও অবজ্ঞার বস্তু নয়। নিরঞ্জনরায় বলেন- "Brahmacharya is a civiling agency, if anybody speaks against of it. I will fight like a rusader."[৫] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা গ্রন্থে সমাধিপ্রকাশ মহোদয় বলেছেন-

"ভক্তিহীনের কর্ম শুধু মরুভূমির বালি,
কর্মহীনের ভক্তি শুধু বাসি ফুলের ডালি..□"[৬]

জন্মগত বর্ণনানুযায়ী কর্ম নিকৃষ্ট মনে হলেও সেটা স্বধর্ম হওয়ার দরুণ উত্তম এবং পরের ধর্ম আপাততঃ উত্তম মনে হলেও জীবাত্মার পক্ষে অধর্ম। মনুসংহিতায় আছে-

"বরং স্বধর্মো বিগুণ্যে ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্মেণ জীবন্তি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ□"[৭]

স্বধর্মে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে গীতায় বলা হয়েছে-

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ□"[৮]

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে ধীবরের স্ববৃত্তি কথা অনুস্মরণ করে দেন-

সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ।[৯]

গীতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় করা□ সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভ করাই যোগ শব্দের মূল অর্থ। তাই বলা হয়-"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।"[১০] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথাই বলেছেন। তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন-পরোক্ষভাবে সব কর্মের সমন্বয় সাধন করে সর্বস্তরের মানুষকে একসূত্রে গেথে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নির্বীর্য যুব সম্প্রদায়ের উদ্বোধনের উদ্দীপ্ত বাণীর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেন গীতার একটি শ্লোক পাঠ করলেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাওয়া যায়।–

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ□"[১১]

ফলহীন কোন কর্মের প্রতি আমাদের বিশেষ একটা আগ্রহ থাকে না। যার ফলস্বরূপ আমাদের জন্ম-বন্ধন চক্র আবর্তিত হয়। বেশীর ভাগ মানুষ কর্ম করছে ঠিকই কিন্তু কর্মের তুলনায় কর্মফল লাভই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। কঠোপনিষদে তাই জনজাতিকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার দীপ্তিময় মন্ত্র দিয়েছেন-

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[১২]

সমস্ত শাস্ত্রই আমাদের সাধনার দ্বারা লাভ করার উপদেশ দিয়েছেন। ধনলাভের জন্য যে যত তপস্যা বা পরিশ্রম করে সে তত সুফল লাভ করে। পরিশ্রমই জীবকে সমৃদ্ধি ও সংপ্রাপ্তির সোপান হিসাবে সাহায্য করে। "পরিশ্রমেন বিনা কার্যসিদ্ধির্ভবতি দুর্লভ"□ যে ছেলে যত বুদ্ধিমান, অধ্যয়নশীল সে পরীক্ষায় তত ভাল ফল করবে। সকর্ম কামের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয় না। কাম্যবস্তু লাভ হলে মানুষ কর্মের যে ক্লেশ তা ভুলে যায়। আবার অন্য বস্তুর পিছনে ছুটতে থাকে। নীতিশাস্ত্রে আছে-"উদ্যোগীনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি"-উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেন, কাপুরুষরাই দৈব দেবেন বলেন। তাই বলা হয়-"Industry is the mother of good luck". অর্থাৎ পরিশ্রমই সৌভাগ্যের জননী। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্য গড়ি। চাণক্যনীতিতে পাই-"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ□" শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- নিষ্কামভাবে কর্ম করলে তা একসময় ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবর্ষিত হয়। সেই কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পন করলে মানুষপটে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। মূলকথা কর্মে উদ্যোগী হতে হবে। কর্ম করে ফল কি পাবো? সেই ভাবনাটা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে নিবিষ্ট চিত্তে কর্ম করে যেতে হবে। কারণ কর্ম করতে প্রয়াসি না হলেও সেই কর্মের জ্ঞান লাভ হবে না। তাই গীতায় বলা হয়েছে-

"কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন□
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি□"[১৩]

নিষ্কাম কর্মে মনে প্রফুল্লতা আনে। আমাদের কাজ হল শুধু একনিষ্ঠচিত্তে কর্মই করা। কর্ম ফলের আকাঙ্খা ছেড়ে কর্ম করতে হবে। তাহলেই কর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, সেই কর্মের জ্ঞান জন্মাবে, আর ভক্তিরসের সঞ্চার আনবে। তবেই তুমি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। জীবনের ধর্ম-কর্তব্য করা। এই কর্তব্য কর্মই মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে। "ত্যাগ" অর্থে সর্বশক্তি সমর্পণ করা, আর "সেবা" অর্থে সেই সমর্পিত শক্তিকে আদর্শের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। অতএব ত্যাগ ছাড়া সেবা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-যতকাল বাঁচবে ততকাল কর্ম করবে-এইরূপ যাবজ্জীব শ্রুতির দ্বারা আদেশিত কর্ম সকলেরও জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীর পক্ষে পরিত্যাগ বলা হয়েছে। তাই "যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানাম্ এব কর্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ।"[১৪]

কর্ম দ্বিবিধ- জ্ঞান ও কর্মযোগ। জ্ঞানানুশীলনই সাধকদের যোগই জ্ঞানযোগ। যে যোগীদের নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার যোগই কর্মযোগ। ভাষ্যকার বলেছেন-"কর্মযোগেন কর্ম এব যোগঃ কর্মযোগঃ তেন কর্মযোগেন যোগীনাং কর্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।"[১৫] কর্মযোগনিষ্ঠার ফল চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত রাগদ্বেষশূন্য হয়ে বিশুদ্ধ লাভ করলে, তাতে জ্ঞানাভ্যাসের বা যমনিয়মাদির প্রমান বহুবিধ সন্ন্যাসের যোগ্যতা লাভ হয়। তাই গীতায় বলেছেন-

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ□"[১৬]

কর্ম না করলে শরীর রক্ষা করাও কঠিন। অতএব অনাসক্ত ভাবে কর্মে সম্যকরূপে আচরন কর।

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ□"[১৭]

যজ্ঞকর্মের প্রতি ঋত্বিক যজমানের যাগাদি ব্যাপার থাকে, সেইরূপ যাগাদি ক্রিয়ার পর যজ্ঞ-ফলদানশক্তি বিশিষ্ট একটি অপূর্ব শক্তি লাভ করে। নিষ্কাম যজ্ঞকর্ম স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু। "তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।"[১৮]

জ্ঞানীর কর্ম সাধারন ব্যক্তির জড়তা নাশের জন্য। বিদ্বান্ সমাহিত চিত্তে অবিদ্বানের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম নিজে আচরণ করে তাদের দ্বারা সকল কর্ম করবেন। জ্ঞানী সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য শুভ কর্ম করেন।

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সংমোহিত পুরুষেরা আমরা ফলের নিমিত্ত কর্ম করছি□ গুণকৃত কর্মে আসক্ত হই, সেই কর্ম ফলাসক্তেরা অল্পদর্শী, কারণ তারা কর্মফল মাত্রই সর্বস্ব এইরূপ দর্শন করেন। মনুর মতে অহিংসা, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বর্জন, বেদবিহিত, নিত্য-কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে জীব ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়-

"অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপশ্চরন্নৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্□"

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং"□[১৯] জ্ঞানের আত্মজ্ঞানের আগুনে যার সর্বকর্ম দগ্ধ হয়েছে ব্রহ্মবিদ বুধগণ তাকেই পণ্ডিত বলে। "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"[২০] হে পার্থ, সর্ব অখিল কর্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। "জ্ঞানাগ্নিসর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"[২১] জ্ঞানাগ্নি সর্ব

কর্মকেই ভস্মসাৎ করে ফেলে। কর্মের মূল কাম, কামের মূল বুদ্ধি। সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস করে, বুদ্ধিও নির্বোধ করে তবে যোগরূপ আত্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করার উপদেশই গীতা বারবার দিয়েছেন। সমস্ত কর্মসমষ্টি তার পূর্ণত্ব, চরম সীমা, শেষ জ্ঞানে তখন এই অর্থেই সকল কর্মাদি বলেছেন। সমাধিপ্রকাশ বলেন- "প্রজ্বলিত অগ্নি কাঠসমূহকে যেমন ভস্ম করে তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব কর্মকেই ভস্মসাৎ করে।"[২২] যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্মসমূহ হতে নিবৃত্তি হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন এবং আত্মবৎ হয়েছেন তিনি তার কর্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হন না। গীতায় আছে-

"যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।"[২৩]

গীতা বলেছেন কর্মসমূহের শারীরিক পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্মসমূহের যোগ উন্নততর, কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে সন্ন্যাস যখন কঠিন এবং তাদেরকে যতক্ষণ দেহে আছে ততক্ষণ কর্ম অবশ্যই করতে হবে। তখন কর্ম সমূহের যোগ সম্পূর্ণরূপে পর্যাপ্ত এবং এরা সহজে আত্মাকে ব্রহ্মসমীপে নিয়ে যায়। কর্মের যোগ, ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ এর চরম অবস্থায় বাহ্য নয়, কিন্তু আন্তর, শারীরিক কর্মসমূহের সমর্পণ নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্মসমূহের সমর্পণে ব্রহ্মে, ঈশ্বরের সত্তায়। "ব্রহ্মণি আধার কর্মাণি, ময়ি সংন্যস্য।"[২৪] আরো বলা হয়েছে- "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য।"[২৫] সব কর্ম মনের দ্বারা পরিত্যাগ করা। যখন কর্মসমূহ এইভাবে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়, তখন যন্মাত্র কর্তার ব্যক্তিত্ব থেকে যায়, যদিও তিনি কাজ করেন, তিনি কিছুই করেন না। কারণ তিনি তাঁর কর্মের ফল ত্যাগ করেন না, তাদের কারণকে ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর সন্নিকটে থেকে কর্মের ভার গ্রহণ করেন। পরমেশ্বর কর্মকর্তা, কর্ম এবং কর্মফল হন।

নির্বীজ সমাধিতে যোগী একেবারে নিমগ্ন তাঁর কোনও বাহ্য কর্মাদি আহার, নিদ্রা, মলমূত্রাদি ত্যাগ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ বর্জন পর্যন্ত কোনও কর্ম থাকে না। তাকে গীতায় নিষ্কর্মসিদ্ধি বলে। গীতায়-

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।"[২৬]

যার বুদ্ধি কোনও বিষয়ে আসক্ত নয়, আত্মাকে যিনি জয় করেছেন, যাঁর কোনও বিষয়ে আসক্ত নয়, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্মরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। কর্ম করলে যে মন-অহংকারবুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ তা যখন সর্বদা একাগ্র ভূমিকায় নিরুদ্ধ সম্প্রজ্ঞাতযোগে বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগে তখন কোনও কর্ম করার না থাকায় নৈষ্কর্মসিদ্ধি হয়। গীতায়–"গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"[২৭] অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ জনেরা ব্রহ্মেই যান। এই জন্য গীতায় অর্জুনকে বলেন- "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।"[২৮] অর্থাৎ সর্বকালেই, সর্ব সময়েই, হে অর্জুন, তুমি যোগযুক্ত হও। সর্বদা যিনি যোগযুক্ত ব্রহ্মভূয় ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়।

মূল্যায়নঃ –ভারতীয় সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নিয়ম, ধর্ম কর্মেই নিহিত রয়েছে। কর্মের মধ্যদিয়ে ধর্মমার্গে উন্নিত হওয়া যায়। কর্মবিহীন মানুষ জড়বস্তু। মানুষ সুস্থ্যজীবন যাপন করতে হলে কর্ম করতেই হবে। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে কর্ম করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৎ ভাবনা নিয়ে সৎকর্মই মানুষের জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা হতে পারে।

সহায়কগ্রন্থ

স্বামী বাসুদেবানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪তম মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৯।

দাস, গুরুচরণ, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, জন্মাষ্টমী, ১৪১১।

সরকার, কমল, *চরৈবেতি,* কমলসরকার, কলকাতা, ২০০৯।

আরণ্য, স্বামী সমাধিপ্রকাশ, *নারীর পূর্ণ অধিকার,* শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০।

বসু ড.দুর্গাদাস, *হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব,* ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২০।

চক্রবর্তী সত্যনারায়ণ, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৪।

গঙ্গোপাধ্যায় বীরেশ্বর, বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, রক্তকরবী, কলকাতা, ২০১৮।

ঘোষ জগদীশচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, অষ্টমসংস্কার, ১৯৫৮।

তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২০।

Shstri Pansikar Wasudev Laxman, *SRIMADBHAGAVADGITA*, Pandurang Jawaji, Bombay, 1936.

---

[১] শ্রীমদ্ভাগবত, ৬/২/৪।

[২] গীতা. ৪/১৩।

[৩] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ-১৯।

[৪] গীতা, ১৮/৪৫-৪৬।

[৫] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ-৭।

[৬] গীতা, ১৮/৪৫-৪৬।

[৭] মনুসংহিতা, ১০/৯৭।

[৮] গীতা, ৩/৩৫।

[৯] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৬/১।

[১০] গীতা, ২/৫০।

[১১] গীতা, ২/৩।

[১২] কঠোপনিষদ, ১/৩/১৪।

[১৩] গীতা,২/৪৭।

[১৪] গীতা, ৩/৯।

[১৫] গীতাভাষ্য, ৩/৩।

[১৬] গীতা, ৩/৫।

[১৭] গীতা, ৩/৪।

[১৮] গীতা, ৩/১৫।

[১৯] গীতা, ৪/১৯।

[২০] গীতা, ৪/৩৩।

[২১] গীতা, ৪/৩৭।

[২২] নারীর পূর্ণ অধিকার, স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য, পৃ-৩৩।

[২৩] গীতা,৪/৪১।

[২৪] গীতা, ৫/১০।

[২৫] গীতা, ৫/১০।

[২৬] গীতা, ১৮/৪৯।

[২৭] গীতা, ৮/২৪

[২৮] গীতা, ৮/২৭

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2, Issue 1 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

Sustainable Fisheries Governance in Assam: Protecting Traditional Fishing Communities and Indigenous Rights

Abstract

The traditional fishing communities of Assam —comprising indigenous, scheduled caste, and other marginalised groups—have long depended on the state's rich aquatic ecosystems for livelihoods, cultural identity, and ecological stewardship. However, rapid developmental interventions, hydrological disruptions, lease-based privatisation, and weak legal recognition have endangered their customary rights and socio-economic well-being. Based on the secondary sources of information, this study critically examines the status of traditional fishers in Assam, emphasising their ecological knowledge systems, community-based management practices, and the growing threats they face. The study identifies a wide range of governance-related issues, including fragmented institutional regulation, exclusions through the lease system, the absence of legal frameworks, and socio-economic vulnerabilities arising from caste and gender issues, as well as policy gaps. The communities themselves have responded to these issues through adaptive practices such as cooperative formation, seasonal bans, and diagnostics. The study advocates for rights-based and participatory fisheries governance, involving legally recognised customs of tenure, the integration of fisheries into the work of all relevant agencies, and the strengthening of fisher cooperatives through training and inclusive development policies. The recommendations include reforming the lease system to give greater preference to traditional users, incorporating Indigenous Ecological Knowledge (IEK) into conservation policies, and improving data systems to enable informed governance. By prioritising the rights and roles of traditional fishers, Assam would be able to have its inland fisheries governance aligned with Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 14 (Life Below Water) and SDG 10 (Reduced Inequality), which would be consistent with themes of ecological sustainability and social equity.

.

Abdul Wakil Ali

Department of Economics, Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Assam, India
Email:abdulwakil222@gmail.com
Corresponding Author*: Abdul Wakil Ali
Email of Corresponding Author*: abdulwakil222@gmail.com

Keywords: Inland fisheries governance; Indigenous Rights, Livelihood vulnerability, Community resource management, Customary Tenure

Received: *9th November 2025,* **Accepted:** *14th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

1. Introduction

Assam, a northeastern state of India, is endowed with rich aquatic ecosystems comprising the Brahmaputra and Barak River basins, wetlands (bells), floodplains, and seasonal water bodies that serve as vital lifelines for thousands of traditional and Indigenous fishing communities. These communities, including the Kaibartas, Maimal, and other Scheduled Tribes and backwards castes, have relied on riverine and inland fisheries for generations, not only as a source of sustenance and income but also as a deeply embedded cultural and spiritual practice (Baruah, 2020).

In recent decades, the rapid expansion of developmental activities, construction of embankments and hydropower dams, overexploitation of fish stocks, and the privatisation of fisheries under leasehold systems have disrupted traditional rights and access. At the same time, the lack of formal recognition for indigenous fishing practices and customary tenure arrangements has exacerbated marginalisation and led to socio-economic vulnerability (Nayak, 2014; Das & Saha, 2021).

On 25th September 2015, the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, comprising 17 Sustainable Development Goals (SDGs), 169 targets, and 304 indicators. As a signatory, India committed to this global agenda, and the Government of Assam launched its state-level initiative, "Assam-2030 in light of SDGs," effective from 1st January 2016. Recognising the vital contribution of fisheries to socio-economic development, the Department of Fisheries, Govt. of Assam, seeks to align its initiatives with the SDGs. Given that over 95% of the state's population consumes fish, the sector holds significant promise for advancing SDG 1 (No Poverty), SDG 10 (Reduced Inequality) and SDG 14 (Life Below Water). The sector can play a transformative role by promoting community-based development and strengthening rural livelihoods. Protecting traditional fishers' rights and knowledge systems is essential for achieving social equity and ecological sustainability. The intersection of indigenous rights, environmental justice, and participatory governance forms a critical area of inquiry. Therefore, "Sustainable Fisheries Governance in Assam: Protecting Traditional Fishing Communities and Indigenous Rights" is adopted. To achieve the overall aim of the study, the research seeks to assess the socio-ecological significance and present status of traditional fishing communities in Assam, examine the major threats to customary

tenure systems and indigenous fishing rights, and evaluate the existing fisheries governance framework in the state in relation to the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Methodology

This study utilizes a qualitative, desk-based research design grounded in secondary data analysis to explore the socio-ecological significance, livelihood vulnerabilities, and governance issues that traditional fishing communities in Assam face. The interpretative research aims to synthesize existing knowledge to evaluate the policy implications of existing frameworks with respect to Sustainable Development Goals.

The data required for this study have been collected from a large number of credible secondary sources, including government publications from the Directorate of Fisheries, Assam (2023), the Statistical Handbook of Assam (2019), Handbook on Fisheries Statistics (2020) and reports of national and international agencies like the FAO and CIFRI. For contextualizing the indigenous fishing practices, tenure systems and socio-environmental transformations, peer-reviewed journal articles, policy documents and academic monographs were consulted.

Aspects of quantitative information, like fish production at the level of district, availability, and per capita consumption of fish were analysed by means of descriptive statistics for the identification of inter-district inequalities to assess resource accessibility, while qualitative aspects were analysed by means of thematic analysis to trace related discourses on aspects of customary rights, ecological degradation and institutional exclusion.

The research design does not include a field component of empirical investigation, but rather lays emphasis on methodological triangulation to be expressed in the use of various credible secondary sources of information in order to raise validity and reliability of the study. While this entails, as a detriment, a shortage of the presentation of lived experience and other micro-level considerations of community dynamics, the virtue of this research has been the provision of a macro-level analysis, as thorough as possible then, of the structural issues to be confronted by traditional fishers.

3. Overview of Fishing Sector in Assam

Fish is an important food source, accounting for nearly one-fifth of global animal protein intake. Fishing provides a livelihood for millions of people, as well as providing valuable foreign exchange earnings to the country. It is a highly perishable food that requires proper

handling, processing and distribution. Fisheries are considered next to the agriculture sector for employment opportunities and food supply. Fish is a vital source of quality protein and is cheaper than other animal protein sources. Around 35% of the people in India are fish eaters, and the per capita consumption is 9.8 kg, while the recommended intake is 13 kg (Manual on Fishery Statistics, CSO-MFS-2011). There are two Prime sectors in fisheries: marine fisheries and inland fisheries. Both sectors play an important role in the Indian economy. Inland fisheries are prime in the Indian economy, specifically in Assam. The Inland fishery resources of Assam can be classified under three broad categories: Capture fishery: Refers to riverine fishery; Culture fishery (aquaculture): It includes ponds and tanks, and integrated culture systems; and Culture-based fishery: It includes beel fisheries, reservoir fisheries, and swamps and low-lying areas. It provides employment and livelihood for fisher communities who solely depend on it. Fisheries are a renewable natural resource, subject to their dynamics, acted upon by various anthropogenic forces. Fishery sector contribution to the Gross Value Added (GVA) for 2016-17 at current price in India is 0.96% and its contribution to the agriculture sector is 5.37% (Handbook on Fisheries Statistics, 2018).

Table 1: State water resources

Resources	**Numbers**	**Water Spread Area (in hectares)**
Beels /Ox-bow lakes	Registered: 430	60215
	Unregistered: 767	40600
Forest Fisheries	71	5017
Derelict water bodies/ swamps/low-lying	3882	116444
Reservoir fisheries	2	2553
Individual Ponds	369304	56566
Community Tank	6328	5152
Total Hectares		286547

Source: Directorate of fisheries, Govt. of Assam

Table 1 presents a detailed categorization of these water bodies along with their respective numbers and water spread areas in hectares.A significant portion of Assam's inland water resources comprises beels and ox-bow lakes, with 430 registered and 767 unregistered beels

covering water spread areas of 60,215 and 40,600 hectares, respectively. Beels are floodplain wetlands that are seasonally connected to river systems, playing a crucial ecological and economic role in rural livelihoods (Baruah et al., 2020). Their productivity and biodiversity make them essential to artisanal and small-scale fisheries in the state.

Forest fisheries, generally located within forested wetland ecosystems, are fewer in number (71) and account for 5,017 hectares. In contrast, derelict water bodies, including swamps and low-lying areas, represent the largest category by area, totaling 116,444 hectares across 3,882 units. These underutilized or neglected water bodies hold significant potential for aquaculture development through scientific intervention (Dey et al., 2016).

In Assam, the reservoir fisheries make very little contribution, as only two reservoirs have been recognised which contribute 2,553 hectares of area. However, the reservoirs provide ample scope for the extension of cage and pen culture technology (Katiha et al., 2005). The only number of ponds dominates as number of units, which are to the tune of 369,304 number covering 56,566 hectares of area, indicate that very much of the consumption-cum-production takes place at household level fish culture in rural areas. The community tanks also number 6,328 units and add to geographical extent of 5,152 hectares with village institutions or cooperative societies managing them. The total area of inland water resources in Assam is to the tune of 286,547 hectares. Thus, the inland water resources possess immense potential for enhancement of fish production and sustainable means of livelihood. Many of these resources have been, however, underutilised due to various factors such as siltation, encroachment, institutional support not being accorded (Department of Fisheries, Assam, 2023).

Fishery plays an important role in the economic development of the Assam. It also plays a significant role in income and employment generation throughout the state. Assam abounds in aquatic resources necessary for development of fisheries. The two main rivers Brahmaputra and the Barak along with their 53 tributaries and numerous floodplain lakes (beels) and ponds constitute traditional sources of fishing in the State. The undulating topography and high rainfall has given rise to vast and varied fisheries resources. Rice and fish are the two basic items in the diet of the Assamese people. About 88.5% of household in Assam eat fish (Statistical Handbook Assam, 2019).

Table2: District-Wise Per Capita Requirement of Fish in Assam.

(In Kg)

District	Requirement District wise per annum	Fish Production	Availability of Fish	Per Capita Consumption
Kokrajhar	14929830	8553890	8779720	8.82
Dhubri	23462220	13599490	12662920	8.1
Goalpara	16966845	9830110	9682050	8.56
Barpeta	23037090	18708120	18728320	12.19
Morigaon	16112580	24044070	24046450	22.39
Nagaon	31849950	56524560	52066560	24.52
Sonitpur	22073385	14903620	15352870	10.43
Lakhimpur	17538210	19424100	19363960	16.56
Dhemaji	11547015	9107010	10697250	13.95
Tinsukia	22347870	18730000	18833600	12.64
Dibrugarh	22321035	15639120	17868720	12.01
Sivasagar	11653095	23655690	24070390	30.98
Jorhat	15566115	10390360	11141610	10.74
Golaghat	17954790	7101000	8526750	7.12
Karbi Anglong	11123280	6145140	6569480	8.86
Dima Hasao	3603150	370730	427840	1.78
Cachar	29225700	40001040	40731040	20.91
Sribhumi	20677695	19060120	20398040	14.8
Hailakandi	11095380	20649790	20651960	27.92
Bongaigaon	12433425	15729850	15910800	19.2
Chirang	8114355	1348190	1372360	2.54
Kamrup	25538895	19602600	20411990	11.99
Kamrup Metro	21102645	6508870	7680080	5.46
Nalbari	12985995	12995620	13096650	15.13
Baksa	15988935	10082490	10149640	9.52
Darrang	15625845	16874810	17052810	16.37
Udalguri	13996275	7315910	7408910	7.94
Biswanath	10307685	5968610	7145090	10.4
Charaideo	7718100	9070140	9748390	18.95
Hojai	15671580	15327600	13802350	13.21
Majuli	2815605	4863940	4889770	26.05
South Salmara	9342075	7510510	6409000	10.29
W. K. Anglong	4970595	927650	1682040	5.08
Bajali	5465100	3060310	3095220	8.5

Assam	525162345	473625060	480454630	13.26

N.B.: Required calculated on the basis of nutritional requirement @15 Kg per capita per annum. Projected population 2023 is use for per capita consumption in Assam
Source: (Table 8.01 to 8.09) Directorate of Fisheries, Assam.

The data on requirements, production, availability and per capita consumption of fish obtained from table 2 related to the districts of Assam for the year 2023, is based on projected populations and the nutritional criterion of 15 kg of fish per capita per year. These statistics collected from Directorate of Fisheries, Assam (Table 8.01 to 8.09) show that there are very marked regional differences in respect to both the production of fish and the consumption of this commodity, both in respect of the self-sufficiency and deficiency of the various districts. The fish requirement figures are calculated on the basis of per capita nutritional requirement of fish of 15 kg. (i.e. 33.072 lb.) a year. For instance, Nagaon requires nearly approximately 31.85 million kg. of fish and produces (from Table. 8.02) about 56.52 million kg. of fish, while the per capita availability of fish is 24.52 kg. (approx. 54,0492 lb.) for the province, (i.e. fish availability per caput in Nagaon is exceedingly more than the nutritional standard) suggesting surplus condition. The districts of Morigaon and Sivasagar shows exceedingly high per Capita availability of fish, viz. 22.39 kg. (app. 49.227 lb.) and 30.98 kg. respectively, testifying to the fact that these districts are important fish producing areas. The districts on the other hand like Dima Hasao (1.78 kg.) Chirang (2.54 kg.) and Kamrup Metro (5.46 kg.) show comparatively poor per capita availability of fish. This would suggest that either such districts must be dependent on imports or else that aquaculture has not developed in these areas to any appreciable extent. The district of Kamrup Metro which in spite of being a metropolitan and therefore a highly economically important district has, however a per capita fish consumption which is considerably low from the point of view of the nutritional requirement (FAO, 2020) it is noteworthy to add, may be on account of inability of supplying fish through urban food systems. The aggregate state figure shows moreover that, about 525.16 million kg. of fish is available for total annual requirement in the state of Assam while total production is only to the extent of 473.63 million kg. The availability (480.45 million kg.) is apparently even a little more than production, which may be on account of imports of fish or of the stock carried over, but the average per capita consumption figure, i.e. 13.267 kg. is lower than the given nutritional standard fish requirement of 15 kg. The gap between production and consumption in the state is thus apparent from the above statistics and calls for remedial measures in the direction of production of fish and development of inland

fisheries infrastructure in backward districts (Baruah & Goswami, 2019) in Assam the qualitative deficiency of fish in those areas, where their percapita fish availability shows a very low figure is also an indication that corrective measures have to be taken in that direction too. The spatial variation which is visible in these district wise fish statistics will call for a rethinking on policy and evaluation of this policy where by its success or failure can be measured. A district wise approach is a must here. The development of hatcheries in deficit districts, appropriate (proper) cold-storage and cold-chain infrastructure and good marketing structures to ameliorate or reduce the costs to consumers in such deficit areas are necessary. This can also be undertaken by adopting a new policy for surplus areas, such type of intra-district co-operative marketing and development in regard to linkages in the value chain for surplus areas can also be adequately provided. (Planning Commission, 2012; NFDB, 2021).

4. Traditional Fishing Communities in Assam

Assam, with its extensive network of rivers, wetlands, floodplains, and ox-bow lakes, supports a significant population engaged in inland fisheries. According to the Department of Fisheries, Assam (2023), the state possesses approximately 286,547 hectares of inland water resources, including over 369,000 individual ponds, 1,197 registered and unregistered beels, 3,882 derelict water bodies, and 6,328 community tanks. These aquatic systems have historically formed the lifeline of traditional fishing communities, predominantly comprising Scheduled Castes such as the Kaibarta, Jhalo Malo, and Namasudras, alongside various Indigenous and Other Backward Classes (Baruah, 2020; Deka, 2016).

The livelihood dependency on these resources is immense. As per the Handbook of Fisheries Statistics (2020) published by the Ministry of Fisheries, Government of India, over 3.5 lakh (350,000) individuals in Assam are directly engaged in capture and culture fisheries. A large proportion of these are traditional fishers, with nearly 65% of fisher households belonging to marginalized caste and tribal groups (Sarma & Goswami, 2017). These communities have relied on fishing as a hereditary occupation, supported by indigenous ecological knowledge, seasonal migratory practices, and communal access to water bodies.

Traditional fishing communities possess a rich corpus of indigenous technical knowledge (ITK), including selective gear usage (e.g., *jakoi*, *chepa*, *barjal*), understanding of fish breeding seasons, water level cycles, and species behaviour. These practices are eco-friendly, low-cost, and closely aligned with the natural hydrology of Assam's rivers and wetlands

(Dutta, 2021). Studies show that in wetland areas like the Deepor Beel or Haram Beel, nearly 80% of the fish catch still comes from traditional methods (Nayak & Berkes, 2010), reflecting the resilience of these systems despite technological changes.

However, the traditional rights and practices of these communities face increasing threats. One major institutional constraint is the lease-based fishery management system, where state-owned water bodies are leased out for fixed terms. Although intended to regulate resource use, this system often excludes traditional fishers. Research indicates that in districts like Barpeta and Nalbari, over 70% of leased beels are controlled by politically connected elites or non-local contractors (Deka, 2016). As a result, only 30–35% of traditional fisher families report secure and continuous access to fishing sites (Dutta, 2021).

Hydrological disruptions caused by embankments, dams (such as the Subansiri Lower Hydroelectric Project), and flood control interventions have further degraded fish habitats and disrupted migratory routes. The Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI) reports a 25% decline in wetland fish productivity in the Brahmaputra floodplains over the past two decades. In addition, climate change has contributed to increased unpredictability in flood timing and intensity, further reducing fish catch and affecting livelihoods (Sharma et al., 2022).

The socio-economic status of traditional fishers remains precarious. Data from the National Sample Survey Office (NSSO) suggests that nearly 65% of traditional fisher households in Assam earn below the monthly poverty line income. Literacy rates in these communities remain lower than the state average, and women fishers—who are heavily involved in post-harvest activities like drying, processing, and marketing—often lack formal recognition and access to markets or credit facilities (Baruah, 2020).

5. Challenges to Indigenous Rights and Loss of Customary Tenure in Assam

Indigenous communities in Assam—including groups such as the Bodos, Misings, Karbis, Dimasas, Rabhas, and others—have historically maintained strong customary relationships with land, forests, water bodies, and communal resources. These relationships are embedded in traditional governance systems, cultural practices, and subsistence economies that emphasize collective ownership and ecological balance (Baruah, 2003; Das, 2017). However, in recent decades, these communities have encountered significant threats to their rights, particularly concerning the erosion of customary tenure systems and the weakening of institutional recognition of Indigenous governance.

One major challenge is the displacement of Indigenous peoples due to large-scale infrastructure projects, including hydroelectric dams, highways, and industrial zones. The construction of the Lower Subansiri Hydroelectric Project near the Assam-Arunachal Pradesh border displaced several Mishing villages and disrupted traditional fishing and river-dependent practices, with inadequate compensation or rehabilitation (Ahmed, 2020). Such displacement often results in the severing of spiritual, economic, and ecological ties to ancestral lands—constituting not only physical relocation but also cultural and ontological dislocation (Fernandes, 2008).

Another key issue is the loss of customary tenure systems, which traditionally governed land ownership, forest access, and water use through community-level institutions and unwritten norms. These systems are increasingly undermined by the formalization of land tenure and state-centric legal frameworks that prioritize individual ownership, leaseholds, and commercial usage over collective rights (Nayak & Berkes, 2010). For instance, in areas outside the Sixth Schedule (which offers constitutional protection for tribal autonomy), such as parts of the Brahmaputra valley and Barak Valley, Indigenous communities have faced dispossession due to the absence of legal recognition for customary rights (Nath, 2014).

The privatization of commons and lease-based allocation of wetlands and forests further intensifies this trend. Under Assam's leasing policies, community-managed beels (ox-bow lakes) and fisheries are auctioned to the highest bidders, often non-local or politically connected entities. This process marginalizes traditional Indigenous fishers, such as the Mishing and Kaibarta communities, and deprives them of access to their traditional resources (Deka, 2016; Dutta, 2021). In many such cases, community members become wage laborers on lands or water bodies they once managed autonomously.

Moreover, the expansion of protected areas and wildlife sanctuaries—though important for biodiversity—has sometimes excluded Indigenous residents from forest-based livelihoods without adequate consultation or rights recognition. The implementation of the *Wildlife Protection Act, 1972* and Forest (Conservation) Act has led to restrictions on traditional shifting cultivation (*jhum*), fuelwood collection, and fishing in buffer zones, undermining customary practices (Choudhury, 2005).

Compounding these challenges is the lack of comprehensive land records in tribal areas, which leaves communities vulnerable to land grabs and encroachment. The absence of legal titles for customary lands limits Indigenous peoples' ability to assert claims or receive

compensation during land acquisition. Furthermore, climate change-induced impacts—such as flooding, erosion, and declining productivity of commons—exacerbate dispossession by making traditional livelihoods less viable (Sharma et al., 2022).

The cumulative effect of these dynamics is the institutional invisibility of Indigenous tenure systems and the weakening of Indigenous autonomy over land and natural resources. Addressing this requires a shift towards a pluralistic legal approach that recognizes and protects customary tenure, ensures free, prior, and informed consent (FPIC) in development projects, and enables co-governance of resources in collaboration with Indigenous institutions.

6. Results and Discussion

The findings of the present study are consistent with earlier research on inland fisheries governance and small-scale fishing communities in Assam and comparable socio-ecological contexts. The institutional exclusion of traditional fishers under lease-based management systems observed in this study supports the findings of Deka (2016), who documented patterns of elite capture and reduced access of local fishing households to beel fisheries. Similarly, the erosion of customary tenure and increasing commercialization of inland fisheries correspond with the analysis of Nayak (2014), who argued that such processes contribute to marginalization and livelihood insecurity among traditional fishers in Assam.

The livelihood vulnerability and socio-economic challenges identified in this study also align with Sarma and Goswami (2017), who reported persistent poverty, limited institutional support, and restricted market access among fisher communities in the region. Furthermore, the significance of Indigenous Ecological Knowledge and community-based resource management highlighted here is supported by Dutta (2021) and Nayak and Berkes (2010), both of whom demonstrated that traditional ecological practices play an important role in sustaining fisheries and conserving wetland ecosystems.

In addition, the spatial disparities in fish production and availability across districts observed in this study are consistent with the district-level assessment by Baruah and Goswami (2019), which identified uneven fisheries development and infrastructural gaps across Assam. Collectively, these converging findings strengthen the argument that participatory governance frameworks, recognition of customary tenure rights, and locally grounded policy

interventions are essential for promoting ecological sustainability and improving livelihood security in Assam's fisheries sector.

7. Conclusion

The study demonstrates the socio-ecological importance and precarious condition of indigenous fishing communities in Assam, which depend for their livelihood, food security and cultural continuity on the state's vast inland water resources. More than 286000 hectares of complex aquatic ecosystems, including beels, swamps, reservoirs and ponds, are found in Assam, but these resources are not fully utilised or are inadequately utilized, due to the problems of hydrological changes, siltation and inequitable forms of governance. The greatly exploited lease-based management system of fisheries has caused the marginalisation of indigenous and traditional fishers, and in many instances, their which has robbed them of access to the commons, which they have, through a system of customary tenure, the various communistic, and also other systems of tenure which facilitated a state of complete development.

The disparities in fish production and per capita consumption across districts also highlight the uneven access to resources and uneven aquaculture development. Some districts have surplus production, while others are very much below the benchmark of 15 kg per capita annually required for nutrition and thus show spatial inequalities and systemic neglect of infrastructure and support mechanisms in those districts with deficits.

Traditional fishermen, especially from Scheduled Castes and indigenous communities, have deep ecological knowledge as well as experience in sustainable modes of fishing. However, their rights and contributions remain largely unrecognised in formal structures of governance. The erosion of customary tenure in conjunction with displacement, privatization and climate variability have exacerbated their socio-economic vulnerabilities.

At this juncture, fisheries governance in Assam needs to move towards more inclusive community-based models in order to conform to Sustainable Development Goals (SDG 1 and SDG 14). This involves legal recognition of customary rights, equitable distribution of

resources, participative decision-making and the incorporation of indigenous systems of knowledge into the policy framework. This is essential for ecological sustainability, social justice and resilient livelihood of rural populations.

References

1. Ahmed, F. (2020). Displacement and the politics of development: A case study of the Subansiri hydroelectric project in Assam. *Economic and Political Weekly, 55*(6), 43–50.
2. Baruah, A. (2003). Customary land rights of indigenous communities in Northeast India: A case study of Assam. In R. Roy (Ed.), *Land rights of indigenous peoples in Asia* (pp. 123–138). International Work Group for Indigenous Affairs.
3. Baruah, A. (2020). Fish, food and fisherfolk: Rethinking inland fisheries in Assam. *Journal of Rural Studies, 76*, 176–185. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.04.002
4. Baruah, A., & Goswami, M. (2019). Patterns of fish consumption and availability in Assam: A district-wise assessment. *Assam Economic Review, 12*(1), 55–73.
5. Choudhury, A. U. (2005). Impact of protected areas on tribal livelihoods in Assam. *Human Ecology, 33*(4), 597–604. https://doi.org/10.1007/s10745-005-5159-4
6. Das, J. (2017). Dispossession and resistance: Customary land tenure and neoliberal land policies in Assam. *Journal of Peasant Studies, 44*(5), 1035–1055. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1259220
7. Das, S., & Saha, S. (2021). Leasing of wetlands and marginalization of small-scale fishers in Assam. *South Asia Research, 41*(3), 340–360. https://doi.org/10.1177/02627280211024391
8. Deka, S. (2016). Leasing, exclusion and elite capture in beel fisheries of Assam. *Economic and Political Weekly, 51*(18), 23–25.
9. Department of Fisheries, Assam. (2023). *Annual report 2022–2023*. Government of Assam. https://fisheries.assam.gov.in
10. Dey, M. M., Shrestha, M. K., &Kambewa, P. (2016). Underutilized inland fisheries and potential for aquaculture development in Assam. *Asian Fisheries Science, 29*(2), 101–112.

11. Directorate of Fisheries, Assam. (2023). *Statistical tables: Table 8.01 to 8.09*. Government of Assam.
12. Dutta, R. (2021). Indigenous knowledge and fisheries management in Assam: A case study of Deepor Beel. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 28*(5), 437–447. https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1904271
13. Fernandes, W. (2008). Development-induced displacement and tribal women. In V. K. Nayaran (Ed.), *Development and tribal women* (pp. 38–54). Rawat Publications.
14. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. https://doi.org/10.4060/ca9229en
15. Handbook on Fisheries Statistics. (2018). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
16. Handbook on Fisheries Statistics. (2020). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
17. Katiha, P. K., Jena, J. K., & Pillai, N. G. K. (2005). Inland aquaculture in India: Past trend, present status and future prospects. *Aquaculture Asia, 10*(2), 8–12.
18. Manual on Fishery Statistics (CSO-MFS). (2011). Central Statistics Office, Government of India.
19. Nath, D. (2014). Customary laws and access to natural resources among tribal communities in Assam. *Journal of Tribal Studies, 19*(1), 84–96.
20. Nayak, P. K. (2014). The political ecology of customary tenure in inland fisheries of Assam, India. *Journal of Political Ecology, 21*, 405–420. https://doi.org/10.2458/v21i1.21125
21. Nayak, P. K., & Berkes, F. (2010). Whose marginalisation? Politics around environmental injustices in India's northeast. *Environmental Justice, 3*(1), 1–7. https://doi.org/10.1089/env.2009.0033
22. National Fisheries Development Board. (2021). *Annual report 2020–21*. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India. https://nfdb.gov.in
23. Planning Commission. (2012). *Report of the working group on fisheries for the Twelfth Five Year Plan (2012–2017)*. Government of India. https://planningcommission.gov.in
24. Sarma, J., & Goswami, D. (2017). Livelihoods and challenges of traditional fishers in Assam. *North East India Journal of Social Sciences, 9*(2), 64–78.

25. Sharma, A., Dutta, R., & Baruah, A. (2022). Climate change and inland fisheries in Assam: A socio-ecological assessment. *Environmental Management, 70*(1), 15–27. https://doi.org/10.1007/s00267-022-01632-1
26. Statistical Handbook Assam. (2019). Directorate of Economics and Statistics, Government of Assam

Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 1, Issue 2 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

অনিরুদ্ধ ও করালী---পুণর্বিচার ও পুণর্নির্মাণ : প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাস

Abstract

নতুনকে অস্বীকার না করেও পুরাতনের ওপর অসীম মমত্ববোধ, এককথায় এই হলো তারাশঙ্করের মনোভাব এবং এই মনোভাবের জন্যই তিনি অনেকের কাছে সমালোচিত—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো 'কৃত্রিম', 'রঙ করা' বলে অনেকেরই অভিমত যে, তাদের অবস্থান উপন্যাসের বস্তুভূমিতে নয়, বরং ঔপন্যাসিকের কল্পভূমিতে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলোকে আবার ফিরে দেখে মনে হয় কৃত্রিম', 'রঙ করা'তো নয়ই, তাঁর সৃষ্ট **চরিত্রগুলো** বরং চূড়ান্ত বাস্তব। ঠিক এমনই কিছু চরিত্রের মুখোমুখি হওয়ার মানসেই আমাদের "গণদেবতা" খোলা, "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "শোনা এবং দুটি উপন্যাসেরই চালচিত্র থেকে বেছে **নেওয়া**, এমন দুটি চরিত্রকে, যারা স্বকীয়তায় মন্ডিত। এদের একজন করালী, সে সময়ের নতুন স্রোতধারাকে প্রবহমান করে দিতে চায় জীবনের ওপর, আর অপরজন পুরানো - নতুন—এই দুয়ের বহুমাত্রিক বিরোধে আন্দোলিত এক অভিনব চরিত্র **অনিরুদ্ধ**। আমি আমার আলোচ্য নিবন্ধে বহু চর্চিত এই দুই চরিত্রের **পুণর্বিচার** ও পুণর্নির্মাণ করার প্রয়াস করবো।

Souvik Bagchi

Department of Department of Bengali, Ishwarchandra Vidyasagar College, Bilonia, India
Email:momikonwar21@gmail.com
Corresponding Author*: Souvik Bagchi
Email of Corresponding Author*: bagchi.souvik2022@gmail.com

Keywords: পুণর্বিচার, পুণর্নির্মাণ, করালী, অনিরুদ্ধ, চরিত্র-বিচার

Received: *20th December 2025,* **Accepted:** *22nd February 2026,* **Published:** *28th February 2026*

নতুনকে অস্বীকার না করেও পুরাতনের ওপর অসীম মমত্ববোধ,এককথায় এই হলো তারাশঙ্করের মনোভাব এবং এই মনোভাবের জন্যই তিনি অনেকের কাছে সমালোচিত--তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো 'কৃত্রিম','রঙ করা' বলে অনেকেরই অভিমত যে, তাদের অবস্থান উপন্যাসের **বস্তুভূমিতে** নয়,বরং ঔপন্যাসিকের কল্পভূমিতে।কিন্তু সত্যিই কি তাই?যদি 'তাই'ই হয়, তাহলে অবশ্য বলার কিছুই নেই।

কিন্তু মতের বিপরীতে পাল্টামত, যুক্তির পাল্টাযুক্তিকে স্বীকার করে নিলে তারাশঙ্করকে নিয়ে কিছু না কিছু বলার দায় আমাদের থাকেই। এইজন্যই তাঁর উপন্যাসগুলোকে আবার ফিরে দেখতে হয়। পাতা ওল্টাতে হয়।আর'উল্টে যখনই বোঝা যায় পাল্টে গেছে' তখন মনে হয় কৃত্রিম','রঙ করা'তো নয়ই, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বরং চূড়ান্ত বাস্তব।

ঠিক এমনই কিছু চরিত্রের মুখোমুখি হওয়ার মানসেই আমাদের "গণদেবতা" খোলা,"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "শোনা এবং দুটি উপন্যাসেরই চালচিত্র থেকে বেছে নেওয়া,এমন দুটি চরিত্রকে,যারা স্বকীয়তায় মন্ডিত।এদের একজন করালী, সময়ের নতুন স্রোতধারাকে প্রবহমান করে দিতে চায় যে জীবনের ওপর, আর অপরজন পুরানো - নতুন--এই দুয়ের বহুমাত্রিক বিরোধে আন্দোলিত এক অভিনব চরিত্র অনিরুদ্ধ।

করালী "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র হলে অনিরুদ্ধ কালজয়ী"গণদেবতা"র।

যে "গণদেবতার" পাতা ওল্টালে আমরা দেখি,গিরীশ সূত্রধর আর এই অনিরুদ্ধ কামার নিজেদের গ্রাম ছেড়ে শহরে দোকান দিয়েছে।গাঁয়ের মানুষের তাই অসুবিধার শেষ নেই। নিরুপায় হয়ে তারা পঞ্চায়েতের মজলিশ ডেকেছে।গ্রামের মাতব্বরেরা উপস্থিত। আসরে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে ছিরু। মজলিশে বাক-বিতন্ডার শেষ নেই।কিন্তু অনিরুদ্ধের সাফ কথা---"আমরা আর ও কাজ করবো না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিশ ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।"[১]

এর আগে পঞ্চায়েতের মুখের ওপর এমন কথা কেউ বলেনি। এখন বলছে, মানে বুঝতে হবে, সময়টা পাল্টেছে। বাস্তবিকই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাংলা তখন। পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়। এক অনিবার্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীণ জীবনের ধারাটাকেই তখন পাল্টে দিচ্ছে।

গ্রামীণ কৃষিপণ্য বাইরে চলে যাচ্ছে। কারখানা জাত শিল্পদ্রব্য হু হু করে দখল করছে গ্রামের বাজার।গ্রামীণ কারিগররা স্বভূম ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে পরভূমে। নগদ মজুরি হয়ে উঠছে চালিকা শক্তি।কাজেই অন্য কারোর পরোয়া কেউ করবে কেন?

অনিরুদ্ধের কথাটাই পরে তাই অনেকের কথা হয়ে উঠছে। অনিরুদ্ধ যা বলেছে পরে সেটাই স্বত্ব:স্ফূর্ত ভাবে বায়েন বলছে, নাপিত বলছে, চৌকিদার বলছে, ঘাটের মাঝি বলছে---"অল্প ধান নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো না ", যাদের কাজ ছাড়া গ্রামীণ সমাজটাই অচল।এ যেন জোতদারের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য গণজাগরণেরই প্রথম ধাপ।বোঝা যাচ্ছে, চিরপরিচিত গ্রামীণ জীবনে কি রকম স্পর্ধায় মাথা তুলছে'নতুন'।

এই'নতুন'কে যে তারাশঙ্কর মানেন নি, এমন নয়। কিন্তু মেনেও যা গেছে, সেই পুরাতনের ওপর তাঁর দুঃখবোধ, আমরা আগেই বলেছি।কিন্তু কোন পুরাতন? সময়ের তাগিদে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হতে বসেছে,এর জন্যই কি তারাশঙ্করের দুঃখ? এটাই কি তাঁর কাছে 'পুরাতন' কিংবা পুরাতনের হারিয়ে যাওয়া?সমালোচকেরা যাই বলুন, নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও, জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির জন্য দুঃখ তারাশঙ্করের নয়।পুরাতনের'আসল তাৎপর্যও সেখানেই,

যেখানে শঙ্কিত হয়ে প্রমাদ গুনছেন তারাশঙ্কর। দেখছেন, গ্রামীণ পরম্পরা, সংস্কারের ওপর কিভাবে দাঁত বসাচ্ছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ।

নইলে,জোতদার-মহজনের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখেন নি, এমন নয়। বরং দেখেছেন বলেই অমন স্বকীয়তায় অনিরুদ্ধকে তুলে ধরেছেন তিনি। ছিরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ অনিরুদ্ধ। তার নামে বাকি খাজনার ডিক্রি জারি হয়েছে। জমি নিলামে উঠলো বলে। শেষমেশ জমি বাঁধা দিয়ে সে খাজনা মিটিয়েছে। কামারশালা সারিয়ে তার সুস্থ জীবনে ফেরার মুহূর্তেই আবার ঘটেছে ছিরুর আক্রমণ। প্রতিহিংসায় জ্বলে ছিরুর বাগান তছনছ করেছে অনিরুদ্ধ। অপরাধ স্বীকার করে জেলে গেছে।কিন্তু তারপর?

আমরা দেখেছি,শহরের এক গণিকার পাল্লায় পড়ে এরপর কলকাতায় উধাও হয়ে যাচ্ছে সে।কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ছে পরিধিতে কিংবা বলি, centre থেকে wider এ। যার শুরুটা হয়েছিল শিবকালী পুর ছেড়ে তার শহরে দোকান দেওয়ায়।আর শেষে সে হয়ে গেছে কলকাতার ফিটার--কালের এমনই পরিবর্তন!

এই কাল আর স্থান, দুইয়ের মধ্যে এক সহজ সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছিলেন বাখতিন, যা সাহিত্যে শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং একটি অপরটির সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে কাল যেমন নতুন হয়ে ওঠে, স্থানও তার পুরাতন বেশভুষা পরিহার করে।এইজন্যই বোধহয় কলকাতা থেকে হঠাৎ গাঁয়ে ফিরে শিবকালীপুরকে মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি অনিরুদ্ধ।

হ্যাঁ, সে ফিরেছিলো wider থেকে centre এ।আসলে পরিধিতে ছড়িয়ে পড়লেও কেন্দ্রের প্রতি মানুষের টান যে দুর্ণিবার। কিন্তু কালের লীলায় হিসেব উল্টে গেলে, স্থান পাল্টে গেলে পরিণামে সেটাই কখনো কখনো তার স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেটা অনিরুদ্ধের হয়েছে।কলকাতায় গিয়ে দেদার ফুর্তিতে জীবন কাটিয়ে দিলেও, যখনই তার পদ্মের কথা মনে হয়েছে, সে গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু তার স্ত্রী পদ্ম ততদিনে নিরুদ্দেশ। আর তার স্বৈরিণী পালিয়েছে। শিবকালীপুরের হিতু কর্মকারের নাতি তাই বেদনা নিয়েই আবার ফিরে গেছে কলকাতায়।

প্রায় এই রকমেরই ঘটনা ঘটেছিলো তারাশঙ্করের ওপর উপন্যাস "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"তেও।করালীর ডাকে সাড়া দিয়ে কাহারপাড়া থেকে যারা চন্দন পুরে রেলের কাজ করতে গিয়েছিলো, তারাও একসময় বালিভরা হাঁসুলী বাঁকেই ফিরতে চেয়েছে। ফিরতে চেয়েছে করালী নিজেও, মাটির টানে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু এই, গাঁয়ে ফিরে অনিরুদ্ধর স্বপ্ন ভেঙেছে আর করালী তার স্বপ্নকে সাকার করার সাধনা করেছে। অর্থাৎ কাল ও স্থানিক সম্পর্কের সহজাত সংশ্লিষ্টতার পরিনাম এখানে দ্বিমুখী---হয় সেটা 'বেদনা', নয়তো 'সাধনা'।কিন্তু ফলকথা সেই 'পরিবর্তন'। একটির অপরটির সাপেক্ষে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যেখানে মানুষের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"তেও আমরা দেখেছি,বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কাহারদের সমাজটাকে পাল্টে দিচ্ছে। একটা শক্তির জন্ম হচ্ছে, যা কেন্দ্রাতিগ হলেও কেন্দ্র বিমুখ নয়--এরই সার্থক ব্যক্তিরূপ করালী। Centre থেকে wider এ ছড়িয়ে পড়লেও তাই তার ফেরার পথটা বন্ধ করছেন না তারাশঙ্কর। যদিও সমালোচক দের একাংশ করালীর এই ফিরে আসাটাকে খুব ভালোভাবে নেন নি। তাঁদের মতে, এরজন্যই চরিত্রটা পূর্বাপর সঙ্গতি হারিয়ে অবাস্তব হয়ে গেছে।কিন্তু আমাদের মনে হয়,করালীর ফিরে আসাটা অস্বাভাবিক ছিল না।

সর্বতোভাবে পরিবর্তনকামী করালী আসলে চেয়েছিলো কাহাররা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক। এটা বুঝে প্রমাদ গুনেছে বনোয়ারী---"সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে,এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহার পাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে"[২], 'সর্বনাশ'আর'মঙ্গল', বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর সম্পর্কটা এমনই বহুমাত্রিক। 'বহুমাত্রিক' বলেই সে করালী কে প্রত্যাখ্যান করে, স্নেহও করে। তার উত্তরাধিকারীও বানাতে চায় তাকেই।

আসলে প্রবীন বনোয়ারী, সংস্কার আর প্রথা-পরম্পরায় আনুগত্য তার প্রবল। আর করালী নতুন পথের পথিক।পুরনোর সঙ্গে এই নতুনের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে যুগপৎ প্রত্যাশা আর স্নেহকে লালন করে যান বলেই তারাশঙ্কর বনোয়ারীকে উপেক্ষা করেন না, আবার করালীকেও কাছে টানেন।

আর তারপরে বাস্তবের শর্ত মেনেই সংঘর্ষ হয় সময়ের সঙ্গে সময়ের।করালী হয়ে ওঠে সেখানে ভবিষ্যতের নায়ক।আর তারাশঙ্কর লেখেন --"হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে। বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে"[৩] ,আসলে সে হাঁসুলী বাঁকের 'নতুন কথা' তৈরী করতে চায়। তার ফেরার পথ বন্ধ করে দিলে যে সেই'নতুনকথা'হবেনা, তারাশঙ্কর জানতেন। হাঁসুলী বাঁকের 'নতুনকথা 'তৈরীর দায়িত্ব তিনি ভবিষ্যতের ওপর দিয়েছেন।তাই ভবিষ্যতের নায়কই বালি কেটে মাটি খোঁজে। আসলে সে জীবনকে খোঁজে।

যে জীবনকে খুঁজতে গিয়ে কলকাতা থেকে শিবকালীপুর ফিরে ধাক্কা খেয়েছিলো অনিরুদ্ধ। তাই "গণদেবতা" শিবকালীপুরের উপকথা হয়নি। এই'উপকথা' হওয়া এখন যেমন শক্ত, হাঁসুলী বাঁকের'নতুনকথা'তৈরী করাটাও সহজ নয়। তারাশঙ্কর সেটা বুঝেছিলেন শুধু জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখেছিলেন বলেই। কল্লোলের কেতাদুরস্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামীণ জনজীবনের হাটে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন এবং সেই জীবনের মধ্যে যেমন অনিরুদ্ধের মতো স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি করালীর মতো স্বপ্নকে সাকার করতে চেয়েছেন।অর্থাৎ একদিকে বেদনা, আরেকদিকে প্রত্যাশা,এই দুটোকেই নিয়েছেন তিনি।কিন্তু মিলিয়ে এককাকার করেননি।

যদি মেলানোর চেষ্টা করতেন, তাহলে কালের গতি রুদ্ধ হতো, স্থান হতো constant, যা কখনই সম্ভব নয়।অতএব জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতাই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে অন্য মাত্রা দিয়েছে, করে তুলেছে চূড়ান্ত বাস্তব, তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১. দ্রষ্টব্যঃ "গণদেবতা"----তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কোল—৭৩ পৃষ্ঠা ৯।

২. দ্রষ্টব্যঃ"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" ---"তারাশঙ্কর-রচনাবলী"সপ্তম খন্ড,চৈত্র ১৩৮০,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি: পৃষ্ঠা ২৮১।

৩. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৮।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ:

১. বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর---"গণদেবতা" --- সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কোল--৭৩

২. বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর----"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা "--তারাশঙ্কর রচনাবলী---সপ্তম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোল-১২।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাশ ড. শেখর--"তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজচিন্তা", প্রথম প্রকাশ, বইমেলা--২০০৫, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা

২. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার--"বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", সপ্তম পুণর্মুদ্রণ ১৯৮৪,মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৭৩

৩.বন্দোপাধ্যায় সরোজ--"বাংলা উপন্যাসের কালান্তর", পঞ্চম সংস্করণ,নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩

Publisher

Research and Development Cell
Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College Katlcherra
P.O. Sultanicherra, Hailakandi, Assam, India-788162
Email: Researchcell@pdugmck.ac.in
URL: https://pdugmck.ac.in/index.php/journal/
Phone: 9706276296